কর্মযোগী কৃপাশরণ

শীলানন্দ ব্রহ্মচারী

কর্মযোগী কৃপাশরণ

ভারতে বৌদ্ধধর্মের পুনর্জাগরণের অন্যতম পথিকৃৎ,
বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা, বিহার ও
জগজ্জ্যোতি পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা

কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে "হৃদয়ের দরজা খুলে দিন" বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু। কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠার বছর খানেক পর "kalpataruboi.org" নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকেউ এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!
জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

This book is scanned by B Jyoti Bhante

কর্মযোগী কৃপাশরণ

শীলানন্দ ব্রহ্মচারী

বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা
বেঙ্গল বুদ্ধিস্ট অ্যাসোসিয়েশন
১, বুদ্ধিষ্ট টেম্পল স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০১২

Karmayogi Kripasaran
By Silananda Brahmachari (1907-2002)

প্রথম প্রকাশ বৈশাখী পূর্ণিমা ১৩৫৭
প্রকাশক তরণীসেন বড়ুয়া

দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ, প্রবারণা পূর্ণিমা ১৪১৪/২০০৭
প্রকাশক হেমেন্দুবিকাশ চৌধুরী
সাধারণ সম্পাদক
বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা
১, বুদ্ধিষ্ট টেম্পল স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১২
দূরভাষ ২২১১৭১৩৮/২২১১৯২৯৪
দূরবার্তা ২২১১৮৮০১

মুদ্রণ নিউ গীতা প্রিন্টার্স
৫১, ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা-৯

মূল্য ২৫ টাকা

ISBN 978-81-86551-36-3

মুখবন্ধ

পুরীর সমুদ্রতটে বসে যখন আমি প্রাতঃস্মরণীয় মহাস্থবির কৃপাশরণের জীবনকথা লিখতে আরম্ভ করি, তখন সমুদ্রের পানে চেয়ে আমার প্রতিভাত হয়—এই সমুদ্রের মত অন্তহীন জীবনের গভীরে ডুবে যিনি অমৃত মন্থন করেছেন তাঁর জীবনের উপলব্ধি সহজসাধ্য নয়। যাহা উপলব্ধির অতীত, তাহা ব্যক্ত করবার প্রয়াস বিফলতা মাত্র। তথাপি আমি অনুভব করি, মহাস্থবিরের জীবন যতই অগম্য হোক না কেন, তাঁর জীবনের ঘটনানিচয় আমাদের মনকে স্পর্শ করে এবং বৃহত্তর আদর্শ সম্মুখে ধরে; আমরা মুহূর্তের জন্য ক্ষুদ্রতার সীমা অতিক্রম করে উদার জগতের সন্ধান পাই। এইজন্য তাঁর জীবনকাহিনী আমাদের কাছে অর্থহীন প্রলাপ হতে পারে না। তাই আমি তাঁর জীবনের ইতিবৃত্ত রচনা করতে প্রবৃত্ত হয়েছি। এতে যদি অনুসন্ধিৎসু পাঠকের কিঞ্চিন্মাত্র উপকার হয়, তা হলে শ্রম সার্থক মনে করব।

এই জীবনকাহিনী রচনায় আমি যাঁদের কাছে ঋণী, তাঁদের মধ্যে স্বর্গীয় সুরেন্দ্রলাল মুৎসুদ্দী মহাশয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভার সম্পাদকরূপে মহাস্থবিরের একান্ত সাহচর্য্য লাভ করে তাঁর জীবনের ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করে পরবর্তী জনতার কল্যাণ সাধন করেছেন এবং আপনার আদর্শনিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন। আমি সশ্রদ্ধ চিত্তে তাঁদের সকলের ঋণ স্বীকার করছি। আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীঅনিলকুমার সিংহ মাঝে মাঝে প্রুফ সংশোধন করে আমাকে বাধিত করেছেন।

শীলানন্দ ব্রহ্মচারী

প্রকাশকের নিবেদন

সুদীর্ঘ পঁচিশ বৎসর অতীত হল, পরমপূজ্য কৃপাশরণ মহাস্থবির দেহরক্ষা করেছেন। আমার পিতৃব্য বলে তিনি শুধু আমার নন, সমগ্র বৌদ্ধজাতির —বিশেষভাবে বাঙালী বৌদ্ধসমাজের অতি আপনার জন। সুতরাং আমরা তাঁকে ভুলতে পারি না। যতদিন পর্যন্ত ভারতে বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধ সমাজ বিরাজ করবে, ততদিন পর্যন্ত তাঁর নাম বৌদ্ধ জাগরণের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে উজ্জ্বল থাকবে। তাঁর সম্বন্ধে নতুন করে বলবার কিছু নেই। তবে তাঁর রক্তবিন্দু দিয়ে যে প্রতিষ্ঠানসমূহ গড়ে উঠেছে, সেই সমূহের পরিচালকবর্গের নিকট আমার অনুরোধ—তাঁরা যেন মহাস্থবিরের স্মৃতিপূজায় উদীয়মান তরুণসমাজকে অনুপ্রাণিত করেন।

পঁচিশ বৎসর ধরে মহাস্থবিরের পুণ্যপূত জীবনের লিপিবদ্ধ বৃত্তান্ত যক্ষের ধনের মত রক্ষা করে এসেছি। আজ স্নেহাস্পদ শ্রীমান বরদারঞ্জন বড়ুয়া ও শ্রীমান রোহিণীরঞ্জন বড়ুয়ার অর্থানুকূল্যে তা পুস্তকাকারে জনসমাজকে দিতে পেরে অনির্বচনীয় আনন্দ অনুভব করছি। এতে আমার চিরদিনের আশা সফলতা লাভ করেছে। এজন্য আমি শ্রীমানদ্বয়ের নিকট বিশেষভাবে ঋণী।

উপসংহারে আমার বক্তব্য এই, গ্রন্থ বিক্রয়ে যা লাভ থাকবে, তা মহাস্থবিরের স্মৃতিরক্ষার জন্য উপযুক্ত ট্রাষ্টের হস্তেই অর্পণ করা হবে। আশা করি, জনসাধারণ এই শুভ চেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করে বাধিত করবেন। ইতি—

বৈশাখী পূর্ণিমা, ১৩৫৭ **তরণীসেন বড়ুয়া**

উৎসর্গ

পিতামহ বিপিনচন্দ্র বড়ুয়া

পিতামহী শেফালিকা বড়ুয়া

মাতামহ জ্ঞানদারঞ্জন চৌধুরী

মাতামহী প্রতিভাময়ী চৌধুরী

পিতা প্রদীপরঞ্জন বড়ুয়া

মাতা কুমকুম বড়ুয়া

অমর স্মৃতির উদ্দেশ্যে এই পুস্তকখানি পুনর্মুদ্রিত হল

পার্থপ্রতিম বড়ুয়া

ভিক্ষু বোধিপাল

ভূমিকা

নমো তস্‌স অরহতো ভগবতো সম্মা সম্বুদ্ধস্‌স।

'অত্তো হি অত্তনো নাথো' আপনিই আপনার নাথ প্রবচনটি ধম্মপদের শিক্ষাপদ। এই বুদ্ধবচনের প্রমাণ পুদ্গল ছিলেন পূজ্যপাদ ভদন্ত কৃপাশরণ মহাস্থবির। তাঁকে চোখে দেখার সৌভাগ্য যাঁদের ঘটে নি, তাঁদের কাছে ভদন্ত কৃপাশরণের জীবনের ছবিখানি তুলে ধরেছেন আর একজন কল্যাণমিত্র প্রয়াত শীলানন্দ ব্রহ্মচারী। তাঁর লেখা "কর্মযোগী কৃপাশরণ" বইখানিকে তিনি 'প্রাতঃস্মরণীয় মহাস্থবির কৃপাশরণের জীবনকথা' বলে পরিচয় দিয়েছেন। মনে করি, তার উর্ধে। ঐ পুস্তিকাখানি ভদন্ত কৃপাশরণ মহাস্থবিরকে লোকোত্তর মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছে।

কল্যাণমিত্র শীলানন্দ ব্রহ্মচারীর নিজের ভাষায়, 'যাহা উপলব্ধির অতীত, তাহা ব্যক্ত করবার প্রয়াস বিফলতা মাত্র।' ঐ বাক্য যথার্থ। "কর্মযোগী কৃপাশরণ" বইখানি পড়তে পড়তে বারবার বোধ জাগে 'রত্নপুদ্গল' কি? 'আর্যগোত্র' কাকে বলে? এগুলি কি কেবল ত্রিপিটকের বচন মাত্র? বৌদ্ধ মাত্রই জানেন, ভগবান বুদ্ধের শিক্ষাপদের মূল কথা তিনটি—

এমন কিছু করবে না যার অনুশোচনা করতে হয়।

তাই করলে কুশলে সম্পদ লাভ করবে।

তা পেতে হলে নিজের চিত্তকে উজাগর কর, সচিত্ত পরিওদাপন।

এগুলি নীতিবাক্য নয়, জীবনের প্রতিজ্ঞা। সময় গ্রহণ। আজকে সময় শব্দটির তাৎপর্য লঘু হয়ে গেছে। সময় হোল প্রতিজ্ঞা পালনের নিষ্ঠা। সাধারণ মানুষ পাঁকের— সে কেমন করে পদ্ম ফুল হয়ে ওঠে; অরিয় (আর্য) হয়ে ওঠেন তিনি। সেই পথের সন্ধান যিনি দিতে পেরেছেন তিনি বোধিসত্ত্ব, আর যিনি তা পেয়েছেন, তিনিই বুদ্ধ। বোধি লাভের বিষয় নয় — উজাগরতা, নিজেকে নিজের উদ্বোধন। তা—অত্তো হি অত্তনো নাথো।

"কর্মযোগী কৃপাশরণ" কল্যাণমিত্র শীলানন্দ ব্রহ্মচারীর এক অনবদ্য সাহিত্য সম্ভার। বইখানি বৌদ্ধ সাহিত্যের বাংলা ভাষায় এক শিল্প প্রতিমা। যাঁদের সেই শীর্ণকায়, উন্নতশির কর্মযোগীকে চাক্ষুষ দেখার সুযোগ ঘটে নি, তাঁরা 'কর্মযোগী কৃপাশরণ' পড়লে যে ব্যক্তিত্বের সন্ধান পাবেন তা স্বয়ংসিদ্ধ। জীবনীকারের কুশলতা সেখানে চরিতার্থ হয়। জীবনী রচনা কারুর জীবনের ঘটনাপঞ্জী নয়। সেখানে সন তারিখের হিসাব দেওয়া অনেকটা মহাফেজখানার চৌকীদারী।

অনেক সময় অভিযোগ আসে ভারতবর্ষের সাহিত্যে জীবনী আর আত্মজীবনী পুরোনো আমলে ছিল না। ইংরেজরা ভারতীয় সাহিত্যে তা চালু করেছে। যেমন উপন্যাস বা নভেল ও ছোট গল্প লেখা ইংরাজী সাহিত্যের কাছে ঋণমাত্র। সত্যি কি তাই! জন্ম

তারিখের উল্লেখ, মৃত্যুতিথির পরিচয় তো খাজাঞ্চির কাজ। তা দিয়ে মানুষকে জানা গেল কি? সে প্রশ্ন থেকে যায়। শীলানন্দ ব্রহ্মচারী নীরবে বাংলা সাহিত্যের জগতে যে সব সম্পদ রেখে গেছেন, তাদের ভিতর 'কর্মযোগী কৃপাশরণ' মহা উত্তম, মহোত্তম।

লেখক যেভাবে ভদন্ত কৃপাশরণের জীবনের আলেখ্য এঁকেছেন, তাকে জীবনের ইতিবৃত্ত নিজেই বলেছেন। তা চতুষ্কোণ। চারটি কোণ এইরূপ—

১। প্রাক ভিক্ষু জীবনের কাহিনী। যা ১২৭২ বাংলা সালের ৭ই আষাঢ় চট্টগ্রামের পটিয়া থানার উনাইনপুরা থেকে শুরু। চতুষ্কোণের প্রথম বাহুটি কুড়ি বছর ধরে বাল্য ও কৈশোর। তা জীবনের ওঠাপড়ার ভিতর দিয়ে বৌদ্ধ সঙ্ঘগুরু মহাত্মা পূর্ণাচারের সান্নিধ্য লাভ করেছিল। অপর একটি বাহুর মাঝে কৌণিক বিন্দুতে মিলে ছিল। ঐ বাহুর প্রসারে সুধনচন্দ্র মহাস্থবিরের কাছে বুদ্ধ শাসনে শ্রামণের দীক্ষার ঘটনা তাঁর ভাবী সম্ভাবনার সূচকমাত্র ছিল। কৃপাশরণের বালক জীবনের কঠোর কষ্ট সহিষ্ণুতার যে চিত্র জীবনী লেখক তুলে ধরেছেন, তা পাঠক মাত্রের হৃদয়কে স্পর্শ করে।

২। ভিক্ষু কৃপাশরণের জীবনের সংকল্প গ্রহণ। তাঁর জীবনের আর একটি কোণ। চীবর ধারণ করা বড় কঠিন। বৌদ্ধ বিনয়-পিটক অনুসারে মানবজীবনের যুগ-সন্ধিক্ষণে অর্থাৎ কুড়ি বছর বয়সে নিষ্ঠার সঙ্গে তিনটি চীবর খণ্ড ও ভিক্ষাপাত্র গ্রহণ করে লোককল্যাণের জন্য বহুজনের হিতসাধনে, সুখ বিধানে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করা হোল 'উপসম্পদা' বা ভিক্ষুব্রত গ্রহণ। সেই সময় আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গে সম্যক সংকল্পের সূচনা। নবীন ভিক্ষু কৃপাশরণ উপাধ্যায় হিসাবে সঙ্ঘগুরু পূর্ণাচারের পদপ্রান্তে নিজকে সমর্পণ করেছিলেন। তার পর কৃপাশরণের জীবনের চর্যায় নূতন অধ্যায় ঘটেছিল। তা ছিল, বৌদ্ধ তীর্থ ভ্রমণে উপাধ্যায়ের সদ্ধিবিহারিক ব্রত পালন। সদ্ধিবিহারিক ও উপাধ্যায় বৌদ্ধ বিনয় অনুসারে শিক্ষাব্রতের মূল। লেখকের লেখনীতে বুদ্ধাব্দের তেইশ-চব্বিশ শতকের সারা ভারতবর্ষ জুড়ে বৌদ্ধ জাগরণের আলোর পরিচয় প্রাঞ্জলভাবে ফুটে উঠেছে। ঐ আলোকের স্পন্দনে তরুণ বৌদ্ধভিক্ষুর দৃষ্টি সম্যকভাবে প্রসারিত হয়েছিল। তিনি মনে মনে সংকল্প করেন— ভারতে আবার বুদ্ধ মহিমা প্রচারের জন্য আপনার জীবন উৎসর্গ করবেন।

৩। তৃতীয় কোণটি যেমন বেদনার, কৃচ্ছতার, তেমনি দৃঢ়তার। অনেক আগেই বাল্যকালে পিতাকে হারিয়ে একমাত্র স্নেহময়ী জননীকে ধরে চলছিলেন। বাক্‌সারার বৌদ্ধ বিহারে থাকাকালীন সেই আলম্বন সরে গেল। পিতৃ-মাতৃ হারা ভিক্ষু কৃপাশরণের জীবনে পিছুটান আর কিছু রইল না। অগণিত জনবহুল 'কলিকাতা' (অধুনা কলকাতা) শহরে বৌদ্ধ বিহারে ভিক্ষু কৃপাশরণের আসার

ঘটনা একটি কৌণিক বিন্দু। ঐ বিন্দুর প্রসারের হেতু-ফলে আজকের 'বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর বিহার'। কর্মযোগী কৃপাশরণের জীবনের শ্রেষ্ঠ অবদান। ঐ কৃতসংকল্প কর্মযোগী বাংলা ১২৯৮ সালের আশ্বিনী পূর্ণিমায় বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা নামে একটি সমিতি স্থাপন করেছিলেন।

৪। শেষের কোণটি বিশ্বে জুড়ে বৌদ্ধমতের প্রসার। যা ছিল তাঁর জীবন-মরণ-প্রয়াস। বহুজনের হিত ও সুখের জন্য কৃপাশরণ মহাস্থবির যে কোন বাধা ও বিপত্তি থেকে নিরসনের 'উপায়' খুঁজেছিলেন। ফলে, তাঁর জীবনসাধনা 'সিদ্ধ' হয়েছে। সেকথা শীলানন্দ ব্রহ্মচারী সনিষ্ঠভাবে তাঁর বইখানির ছত্রে ছত্রে কালির আখরে রেখেছেন। ছয়টি (দুই থেকে সাত) অধ্যায়ে লেখক চীবরধারী শ্রমণ কৃপাশরণকে লোককল্যাণে ব্রতী কর্মযোগীর গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠা করেছেন। শেষের অধ্যায়ে ঐ কর্মযোগীর পরিনির্বাণের যে চিত্রায়িত বর্ণন লেখক রেখে গেছেন, তা ভগবান বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ সূত্রের কথা মনে করিয়ে দেয়। অনেকটা যেন—

আনন্দ : ভগবন, উত্তরকালে ঐ সঙ্ঘের ভার কে নেবে?

ভগবান বুদ্ধ : ধর্ম ও বিনয়ের শিক্ষাপদ।

তারই প্রতিধ্বনি—

"তিনি রোগশয্যায় শোয়ান অবস্থায় বলেন—"আমার দিন তো ফুরিয়ে এসেছে, স্তূপের কাজ আরম্ভ করতে পারলাম না। শিলং এর প্রাপ্ত জমির বিহার নির্মাণও বাকী রয়ে গেল। আমার বিশ্বাস বৌদ্ধ সমাজই এই কার্য সমূহের ভার নেবে।"

এ তো বোধিসত্ত্বের অন্তিম বচন।

বৌদ্ধ সমাজ ভারতীয় সমাজ দর্শনের এক বিস্তৃত অধ্যায়। আজ থেকে ২৫৫০ বছরে বৌদ্ধ সমাজের উত্থান-পতনের ইতিবৃত্ত গড়ে উঠেছে। সমাজ দর্শনের সাধারণ সূত্র, যা কিছু গড়ে ওঠে, তা ভেঙে পড়ে, আবার তা নবরূপে দেখা দেয়। সেই গড়া-ভাঙার ভিতর দিয়ে বাংলার বৌদ্ধ সমাজের এক যুগ পুরুষ ভদন্ত কৃপাশরণ মহাস্থবির। তার জীবনের কর্মাবলী পুনঃসম্পাদিত শীলানন্দ ব্রহ্মচারীর "কর্মযোগী কৃপাশরণ" অনুবাকে দেওয়া রয়েছে। তা থেকে তখনকার বাংলার অর্থাৎ আজকালের পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ এমন কি পার্বত্য ত্রিপুরার বাঙালী বৌদ্ধ সমাজের চালচিত্র পরিস্ফুট। ঘটনাক্রমে ভৌগলিক সীমার ছেঁড়া-কাটা চিত্র বাঙালী বৌদ্ধ সমাজকে বিচ্ছেদিত করতে পারে নি। শুধু ভারতের বৌদ্ধেরা নন, বাংলাদেশের বৌদ্ধেরা নন, ত্রিপুরার বৌদ্ধেরা নন, অসমের বৌদ্ধেরা নন, হিমালয়ের গিরিবাসী বৌদ্ধেরা নন, আধুনিক বৌদ্ধেরা নন, সারা পৃথিবীর বৌদ্ধমতের জন্য কর্মযোগী কৃপাশরণের প্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা। তাঁর প্রতিস্থাপিত 'আর্য বিহার'। তা অধুনা বিশ্বজুড়ে উন্মুক্তদ্বার। সেখানে বৌদ্ধমতে সমাজ কল্যাণের যে ব্রত

গ্রহণ করা হয়েছে তা আধুনিক বৌদ্ধ সমাজজীবনের যুগোপযোগী রূপায়ণ। সেখানে বুদ্ধবচনের ধর্মচক্রপ্রবর্তনের মূলসূত্র পরিস্ফুট—সেখানে চার আর্য সত্যের চতুর্থ পাদ অর্থাৎ আট ধরনের সম্যকতায় 'প্রজ্ঞা' (পালি পঞ্ঞা) ও 'উপায়' (শীলব্রত ও চিত্তের একাগ্রতায় সমাধি) যুগপৎ একাকার হয়ে গেছে।

বাঙালী বৌদ্ধ সমাজের সমাজ কল্যাণের পথে অগ্রসর হওয়ার কথা এই প্রসঙ্গে এসে পড়ে। তা না হলে ভদন্ত কৃপাশরণ মহাস্থবিরের কর্মযোগের পরিচয় অসম্পূর্ণ। বাঙালী বৌদ্ধ সমাজের দুটি পর্ব। প্রাচীন পর্ব ও আধুনিক পর্ব। প্রাচীন পর্ব বুদ্ধাব্দ সতেরো আঠারো শো শতকে ভেঙে পড়েছিল—বিদেশীর রাজনৈতিক অভ্যুত্থানে ভারতবর্ষের সমাজ-বিদ্যায় তখন নূতন অধ্যায়ের সূত্রপাত ঘটেছিল। ঘটনা চক্রে নালন্দা বিক্রমশীলের মতই তখনকার বঙ্গদেশের বৌদ্ধ বিহার, মন্দির, স্তূপ ইত্যাদি ধ্বংসায়িত হয়েছিল। বাঙালী বৌদ্ধেরা কেউ কেউ হিমালয় পেরিয়ে নেপালে, ব্রহ্মদেশে (মায়ানমার) পালিয়ে গেল। কেউ কেউ তখনকার তান্ত্রিক মতাবলম্বীদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল, কেউ কেউ বা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল। ভারতবর্ষের সমাজবিদ্যায় ধর্মের সঙ্গে রাজনীতি বা রাষ্ট্রবিদ্যার ঘনিষ্ঠতা আবহমান চলে এসেছে। সেখানেই পশ্চিমী, বিশেষ করে ইউরোপীয় সমাজবিদ্যার সঙ্গে এশিয়ার সমাজবিদ্যার একটা বিষমতা। ভারতবর্ষের সমাজবিদ্যায় ধর্ম আজকালকার ইংরাজী প্রতিশব্দে রিলিজিয়নে যা বোঝায় তার থেকে বিশেষভাবে ভিন্ন। বৌদ্ধমতে তো বটেই।

ভগবান বুদ্ধ তার মতকে 'সদ্ধম্ম' বলেছেন। আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গে— সম্যক কর্ম, সম্যক আজীব ও সম্যক শীল বলতে গিয়ে এখনকার ভাষায় প্রতিদিনের জীবনের কর্ম প্রণালী, রুজিরোজগারে উপায় বা জীবিকা ও নিয়ামক কর্তব্যের কথা বলা হয়েছে। যা নীতি বিজ্ঞানের বিষয় — সেখানে রিলিজিয়ন, এথিকস্, সোসিওলজী ও প্রফেশনাল সায়েন্স একাকার হয়ে যায়। অতএব আধুনিক বাঙালী বৌদ্ধ সমাজ রেনেসাঁ-উত্তরকালীন ইংরাজ শাসিত 'বেঙ্গল'-এ নবজাগরিত। সেই পর্বের সূচনায় রানী কালিন্দীর মহিমা ও কৃতিত্ব অবশ্য স্বীকার্য। ঐ উজাগর সমাজের সূচনায় চাকমা বৌদ্ধ, ত্রিপুরা বৌদ্ধ ও চট্টগ্রামের বৌদ্ধদের যোগদান মুখ্য। সেদিক থেকে মহাবোধি সোসাইটির অনুপ্রেরণাও উল্লেখযোগ্য। কেন না, ভদন্ত কৃপাশরণ মহাস্থবির ও অনাগারিক ধর্মপাল দুজনেই ভারতবর্ষে বৌদ্ধবিদ্যা, বৌদ্ধসমাজ ও বৌদ্ধচেতনার জাগরণে জীবনপাত করে গেছেন।

তাঁদের প্রয়াস কতটা সার্থক হয়েছিল তা জানতে গেলে ঐ সময়ের কলকাতার বুদ্ধিজীবি ও শিক্ষিত উদারনীতিক ব্যক্তিদের প্রসঙ্গ এসে পড়ে। পালি ও বৌদ্ধ সাহিত্যে উপকরণগুলি ইংরাজ ও ইউরোপীয় অনুসন্ধিৎসু বিদ্বানেরা দুই প্রস্থে উদ্ধার করেছেন। ঐ প্রসঙ্গে কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম উল্লেখ করতে হয়। ঐ সময়ের নীল-কমল মুখার্জী ও আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের উদার মনোভাব তখন বাঙালীর সমাজে বৌদ্ধ-

চেতনার বিকাশে সহায়তা করেছিল। তার ফলে, পূর্ববঙ্গ বিশেষ করে চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, কক্সবাজার, নোয়াখালীর বৌদ্ধ জ্ঞাণীগুণীদের দান স্বীকার করতে হয়।

বাংলা ভাষায় বৌদ্ধ ত্রিপিটকের অনুবাদ শুধু নয়, বৌদ্ধ পত্রিকা সাময়িক ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। ইংরেজরা উদারনীতি অনুসরণ করে তখনকার ভারতীয় জনগণের ধর্ম চেতনার প্রতি কঠোর নিয়মাবলী আরোপ করে নি। তার ফলে প্রত্যেক ধর্মের নেতাই ঐ যুগে নিজের নিজের ধর্ম প্রসারের সমান অধিকার সুযোগ পেয়েছিলেন। শুধু ধর্ম কেন, সামাজিক চেতনা, বিদ্যাগ্রহণ ও অর্থনৈতিক বিকাশে ভারতীয়েরা সমান ভাবে প্রতিযোগিতায় আসার সুযোগ পেয়েছিল।

কৃপাশরণ মহাস্থবিরের রোগ চিকিৎসার সময়ে ইংরাজ চিকিৎসকদের যে উদার মানবতার পরিচয় লেখক শীলানন্দ ব্রহ্মচারী তাঁর লেখায় রেখে গেছেন, তা আজকাল দিনে স্বল্পই মিলে। বাঙালী বৌদ্ধ সমাজের বিকাশে ও জাতিধর্ম নির্বিশেষে মানবমাত্রের হিতসাধনের জন্য ভদন্ত কৃপাশরণ মহাস্থবিরের জীবন উৎসর্গিত। তাঁর জীবনের প্রথম দিকে যে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছিলেন, তার সার্থকতার জন্য তাঁর জীবনকে তিলে তিলে গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর 'বোধিচিত্ত সমতাযোগে' প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাই কর্মযোগী বিশেষণটি সার্থক। রোগ, শোক, পরিবেদনাকে তুচ্ছ করে বাঙালীর শুধু নয়, ভারতের শুধু নয়, বিশ্বের সকল দেশের বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে সবার জন্যে যিনি নিজেকে সমর্পণ করেছিলেন সেই কর্মযোগী কৃপাশরণ মহাস্থবিরকে সশ্রদ্ধ প্রণাম।

আর, তাঁর জীবনকথার রচয়িতা কল্যাণমিত্র শীলানন্দ ব্রহ্মচারীকে তাঁর শতবর্ষ পূর্তি দিবসে অন্তরের সাধুবাদ, শুধু অন্তরের নতি।

আকাশদীপ
অবনপল্লী, শান্তিনিকেতন
বীরভূম ৭৩২২৩৫

সুনীতিকুমার পাঠক

পুনর্মুদ্রণের প্রাক্‌কথন

পরিবর্তনের সঙ্গে প্রগতির সম্পর্ক কতখানি তার মূল্যায়ন করবেন ঐতিহাসিক। কিন্তু অপ্রতিরোধ্য পরিবর্তন যে শুধু বস্তুজগতকে নয়, মনোজগতকে প্রভাবান্বিত করে তার প্রমাণ ইতিহাস পাঠকের অপরিজ্ঞাত নয়। তাই এক সময় সমগ্র বঙ্গভূমির প্রবুদ্ধ মানস বৌদ্ধধর্মে বিচরণ করলেও আপামর জনসাধারণ কেন এদিকে আকৃষ্ট হয়েছিল, তার কারণ সম্বন্ধে কারও অনুসন্ধিৎসা থাকলে তাকে জানতে হবে তদানীন্তন বঙ্গ-দেশের সমাজ ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বুদ্ধ-ব্যাখ্যাত সমাজনীতি। ধর্ম বা দর্শন নয়, শিল্প বা সাহিত্য নয় বুদ্ধের সমাজবিধানই সেদিনকার সাধারণ মানুষকে জাগতিক মুক্তির আস্বাদ দিয়েছিল। এই নীতির আশ্রয়ে এসে তারা অবরোধমুক্তির আনন্দ অনুভব করেছিল। তারপর স্বার্থপ্রণোদিত অন্তরের পঙ্কে পড়ে বুদ্ধচর্চার স্বচ্ছ প্রবাহটি এক ভয়ঙ্করী রূপ গ্রহণ করে। যে চর্চা বঙ্গদেশকে, শুধু বঙ্গদেশ কেন, সমগ্র ভারতভূমিকে প্লাবিত করেছিল তার ধারা ক্রমে ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে প্রায় অবলুপ্তির অঙ্কে আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হয়। নিষ্ঠা ও আগ্রহ অথবা অন্ধ অনুবর্তন—যে কারণে হোক না কেন এই পরিবর্তিত পরিবেশেও বাঙলার মুষ্টিমেয় লোক বুদ্ধকে বর্জন করেন নি। উপলব্ধি বা আচরণের মাধ্যমে ততটা না হলেও, উপাচার নিবেদনের উৎসাহ প্রকাশ করেই তারা নিজেদের বৌদ্ধ পরিচয় দিত।

এই প্রেক্ষাপটে বাঙলার বৌদ্ধসমাজে কর্মযোগী কৃপাশরণের আবির্ভাব এক যুগান্তকারী ঘটনা। তিনি যুগপুরুষ। এই সমাজকে তিনি একশো বছর এগিয়ে দিয়েছেন। কৃপাশরণের একমাত্র লক্ষ্য ছিল ধর্মাঙ্কুর মহামহীরূহে পরিণত হোক, দিকে দিকে আরও ছড়িয়ে পড়ুক। এই লক্ষ্যে তিনি আজীবন অবিচল ছিলেন, কখনও লক্ষ্যচ্যুত হননি। শত কর্মব্যস্ততার মধ্যেও ছিল তাঁর অদ্ভুত এক শান্তভাব। এজন্যই তিনি কর্মযোগী। কর্মযোগী কৃপাশরণ। কৃপাশরণের জীবনব্যাপী এক মননশ্রম আমাদের আধুনিক ভিতের উপর দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। আমরা আজ সম্মানের অবস্থান থেকে অন্যের মুখোমুখি হতে পারছি। নতুন করে বোঝাপড়া করতে পারছি সবার সঙ্গে।

১৯৮০ সালে আমি যখন জগজ্জ্যোতি সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করি, সে-সময়েই কৃপাশরণের একটি জীবনীর অভাব উপলব্ধি করি। সত্যি কথা বলতে কি যে সমাজে তিনি জন্মেছেন, সে-সমাজ তাঁর প্রকৃত মূল্যায়নে ব্যর্থ। ১৯৬৫ সালে তাঁর জন্মশতবর্ষ পালিত হয়েছে ঠিকই, কিন্তু কৃপাশরণচর্চায় উৎসাহ দেখা যায়নি। এমন কি প্রকাশিত হয়নি কোনো জীবনী। কৃপাশরণ নিয়ে একমাত্র জীবনী পণ্ডিত শীলানন্দ ব্রহ্মচারীর লেখা 'কর্মযোগী কৃপাশরণ'। এটি প্রকাশিত হয় ১৯৫০ সালে। তাঁর জন্মশতবর্ষে এই বইটিরই একটি ১৬ পাতার সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এর কোনোটিই এখন পাঠকের উপলব্ধ নয়। ১৯৮৭ সালে আমি একটি ইংরেজি পুস্তিকা লিখি এই শিরোনামে—

Bengal Buddhist Association and its Founder-President Kripasaran Mahathera। এর ভূমিকায় অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক কর্মবীর ধর্মপাল মহাথের বলেন, 'During my tenure of General Secretary, I requested many of our members to undertake such compilation works as reference book, but in vain. Undoubtedly, the task of such reference book, arranging every detaited activity chrohologically is a tough one, but acclaims high appreciation, Sri Hemendu Bikash Chowdhury, Editor of the Jagajjyoti, has keenly noticed such major drawback in the records of our association for which he has taken up the burden himself for filling up the vaccum.'

এরই ফলশ্রুতি ১৯৯০ সালে কৃপাশরণের ১২৫তম জন্মবর্ষ উপলক্ষে জগজ্জ্যোতির এক বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করি, যা সুধীসমাজে সমাদৃত হয়। সম্প্রতি আমরা সভার পক্ষ থেকে বোধিপাল ভিক্ষুর লেখা একটি ইংরেজি জীবনী এবং ডঃ রাজেন্দ্র রামের লেখা একটি হিন্দি জীবনী প্রকাশ করেছি। কিন্তু বাংলায় একটি জীবনীর অভাব আমরা অনুভব করছিলাম। দু-টি লেখাও আমাদের দপ্তরে আসে। নানা বিবেচনার পর ঠিক হয় শীলানন্দ ব্রহ্মচারীর বইটি পুনর্মুদ্রণ করে জন্মশতবর্ষে লেখকের প্রতি আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হবে।

বইটির একটি মূল্যবান ভূমিকা লিখেছেন আমাদের সভার সহসভাপতি বিশিষ্ট তিব্বতবিদ্যাবিশারদ এবং এ বছর ভারতের রাষ্ট্রপতির Certificate of Honour প্রাপ্ত অধ্যাপক সুনীতিকুমার পাঠক। তাঁকে আমাদের সশ্রদ্ধ অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা নিবেদন করি।

এইটির পুনর্মুদ্রণের ব্যয় বহন করেছেন প্রতিষ্ঠাতা পরিবারের অন্যতম কৃতি সন্তান, বুদ্ধগয়া মহাবোধি মহাবিহারের বিহারাধ্যক্ষএবং সভার অন্যতম সহসম্পাদক বোধিপাল ভিক্ষু। ইতিপূর্বেও তিনি 'বোধিবন্দনা' নামে একটি প্রয়োজনীয় পুস্তকের তিন হাজার কপি নিজ ব্যয়ে সভার পক্ষ থেকে বিনামূল্যে বিতরণের ব্যবস্থা করেছেন। এজন্য তাঁকেও আমাদের কৃতজ্ঞতা নিবেদন করি।

মানুষ ইতিহাস নিয়ে বাঁচে না, বাঁচার উপকরণ হচ্ছে ঘটমান বর্তমান। কৃপাশরণের জীবনী পুনর্মুদ্রণ প্রসঙ্গে একটি অতৃপ্তিকর প্রসঙ্গ মনে ওঠে। বর্তমানে বাঙালি বৌদ্ধ ভিক্ষুসংঘের যে অবয়ব আমরা প্রত্যক্ষ করছি, তাতে মনে হয় অমিত শক্তিধর সংঘ অচিরেই তার কার্যকারিতা হারাবে। কৃপাশরণের বর্ণময় জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে সংঘ যদি একতাবদ্ধ হয়, তবে তাঁরা এখনও অসাধ্য সাধনে সক্ষম হবেন। আর কর্মযোগী কৃপাশরণের জীবনী পুনর্মুদ্রণের আমাদের এই বিনম্র প্রয়াসও সার্থকতা খুঁজে পাবে।

প্রবারণা ১৪১৪ **হেমেন্দুবিকাশ চৌধুরী**

এক

দেশবন্ধুর মহাপ্রয়াণে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ উচ্চারণ করেন—

"এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান।"

কবিগুরুর এই উক্তি মহাস্থবির কৃপাশরণের জীবনেও প্রযোজ্য। তাঁর কর্মমুখর পুণ্যপূত জীবনের মহিমা যাঁরা উপলব্ধি করেছেন, তাঁদের তা নতুন করে বলতে হবে না। তাঁর অনুপম আত্মত্যাগ, জীবন্ত সাধনা ও অপূর্ব কর্মধারা বাঙলার ম্রিয়মান বিপর্যস্ত বৌদ্ধ সমাজকে নবজীবন দান করে প্রগতির পথে অগ্রসর করে দিয়েছে এবং ভারতে বৌদ্ধধর্মের ক্ষীয়মান দীপ্তিকে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর করে তুলেছে। এই যুগ-প্রবর্তক কৃপাশরণের জীবনের ইতিবৃত্ত অত্যন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ ও প্রহেলিকাময়। প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে তাঁকে আজীবন সংগ্রাম করতে হয়েছে; কিন্তু কোথাও তাঁর মন পরাজয় স্বীকার করে নি। আরও চলতে হবে, আরও চলতে হবে—ইহাই যেন ছিল তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র।

১২৭২ সালে ৭ই আষাঢ় মঙ্গলবার কৃপাশরণ চট্টগ্রাম পটিয়া থানার অন্তর্গত উনাইনপুরা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আনন্দকুমার বড়ুয়া এবং মাতার নাম আরাধনা বড়ুয়া। আনন্দকুমার দরিদ্র হলেও দারিদ্র্য কোনদিন তাঁকে ম্লান করে নি। তিনি আপনার চারিত্রিক গুণে প্রতিবেশীদের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা অর্জন করেন। আরাধনা হন ধর্মে-কর্মে স্বামীর অনুবর্তিনী। শিশু কৃপাশরণ তাঁদের পরিণত বয়সের ষষ্ঠ সন্তান হয়েও তাঁদের নীড় যেন আলো করে তোলেন। সুন্দর সুঠাম না হলেও তাঁর মুখে এক দিব্য জ্যোতির আভাস ছিল। এইজন্য তিনি সকলের প্রিয়ভাজন হন।

বাল্যকালে কৃপাশরণের অসাধারণত্বের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে তিনি অত্যন্ত শান্ত প্রকৃতির হন। শান্ত বালক বলে পাড়ায় তাঁর সুখ্যাতি রটে। এই শান্ত স্বভাবের জন্য সমবয়সীদের নিকট তাঁকে অনেক রকম নির্যাতন সহ্য করতে হয়। কারণ, তিনি হন তাদের কৌতুক তামাসার নির্বিকার পাত্র।

পিতার আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য যথাকালে তিনি বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারেন নি, বাড়ীতে পড়বারও কোন সুযোগ ঘটে নি। তাঁর নবম বৎসর বয়স পর্যন্ত এভাবেই কাটে। সমবয়সীদের স্কুল যেতে দেখে নিজের দিকে যখন তাঁর দৃষ্টি পড়ে, তখন তাঁর মন বেদনায় ভরে উঠে। তথাপি পিতামাতা মনে ব্যথা পাবেন ভেবে তিনি তা প্রকাশ করেন নি। এই সময় তাঁর পিতা হঠাৎ মারা যান। এতে তাঁদের দারিদ্র্য নিপীড়িত পরিবার বর্ণনাতীতভাবে দুর্দশাগ্রস্ত হয়। তাঁর অসহায় বিধবা জননী সন্তান সন্ততি নিয়ে যেন অকূল পাথারে পড়েন। জননীর এই অবস্থা দেখে দশমবর্ষীয় কৃপাশরণ অত্যন্ত বিচলিত হন। এই বয়সে জননীর ভার লাঘব করবার জন্য তিনি তাঁর এক সঙ্গতিপন্ন আত্মীয়ের

বাড়ী গিয়ে কর্মপ্রার্থী হন। তাঁর কাতর আবেদনে তাঁর আত্মীয় তাঁকে গৃহকর্মে নিযুক্ত করেন। যেদিন তিনি মনিব আত্মীয়ের নিকট পারিশ্রমিক স্বরূপ দুটি টাকা পান, সেই দিনই তিনি ছুটে মার কাছে যান এবং মার হাতে তা দিয়ে আনন্দে বিভোর হন। পুত্রের মাতৃভক্তি দেখে জননীর চোখে জল আসে। তিনি শুধু নীরবে অন্তর দিয়ে পুত্রকে আশীর্বাদ করেন। এই ঘটনাটি কৃপাশরণের জীবনে চিরস্মরণীয়।

বালক কৃপাশরণের নির্লিপ্তভাব, সহজ ভক্তি ও ঐকান্তিক নিষ্ঠার পরিচয় দেখে জননীর হৃদয় অজানা পুলকে ভরতে থাকে। তিনি অনুভব করেন—এ সন্তানের উপযুক্ত স্থান এই গৃহ-কোণ নয়, সে একদিন বৃহত্তর জগতে আপনার স্থান খুঁজে নেবেই। এজন্যই যেন পুত্রের ঐহিক সম্পদ কামনায় তাঁর মন সংকীর্ণ হয় নি, পরন্তু পুত্রের মহত্তম পরিণতির স্বপ্নে তিনি বিভোর হন। অবশেষে তিনি অম্লান বদনে আপনার প্রিয়তম পুত্র কৃপাশরণকে বুদ্ধশাসনে নিবেদন করে দেন। তদানীন্তন কালের স্বনামখ্যাত সুধনচন্দ্র মহাস্থবির এই বালকের অসামান্যভাবের পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হন এবং ১২৮৮ সালে ১লা বৈশাখ তাঁক সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষা দান করেন।

এইখানেই কৃপাশরণের নতুন জীবন আরম্ভ হয়। এই নতুন আবেষ্টনীর মধ্যে তিনি যেন আপনাকে খুঁজে পান। তাঁর জীবনের ভাবধারা অনুকূল অবস্থা লাভ করে পরিণতির পথ কেটে চলে। তিনি বুদ্ধির প্রখরতায় ও স্বভাবলব্ধ গুণে অল্পদিনের মধ্যেই সতীর্থদের শীর্ষস্থান অধিকার করেন।

এই সময়ে বাঙলার বৌদ্ধসঙ্ঘগুরু মহাত্মা পূর্ণাচার সুদীর্ঘ লঙ্কাপ্রবাসের পর স্বগ্রাম উনাইনপুরায় প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি লঙ্কার সুপ্রসিদ্ধ রামঞ্ঞ নিকায় প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। এইজন্য তথাকার রামঞ্ঞ নিকায়ের ইতিহাসে তাঁর নাম চিরস্মরণীয়। তাঁরই অসাধারণ ব্যক্তিত্বের প্রভাবে বাঙলার বৌদ্ধধর্ম তান্ত্রিকতা ও কুসংস্কারের কবল থেকে মুক্ত হয়ে নবজীবন লাভ করে। তাঁরই সুনিপুণ নেতৃত্বে ভিক্ষু সঙ্ঘের মধ্যে নবজাগরণের সূচনা হয়। তরুণ কৃপাশরণ এই মহাত্মার সান্নিধ্য লাভ করে তাঁরই মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হন এবং আপনার বিংশতি বৎসর বয়সে তাঁকে উপাধ্যায় বরণ করে ভিক্ষুব্রত গ্রহণ করেন।

নবীন ভিক্ষু কৃপাশরণ আপনার উপাধ্যায় মহাত্মা পূর্ণাচারের পদছায়ায় বসে বৌদ্ধশাস্ত্র শিক্ষায় নিবিষ্ট হন। তিনি আপনার স্বভাবলব্ধ গুণে উপাধ্যায়ের অতিশয় প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেন। তখন তাঁর উপাধ্যায় বৌদ্ধতীর্থ ভ্রমণের সংকল্প করে কৃপশরণকেই আপনার সহযাত্রী নির্বাচন করেন। বৌদ্ধতীর্থগুলি দর্শনে অতীত যুগের বিরাট স্মৃতি কৃপাশরণের মনকে অভিভূত করে। এক সময় যে বৌদ্ধধর্ম দিকে দিকে পরিব্যাপ্ত হয়ে সমগ্র এশিয়া ভূখণ্ডকে নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল, নতুন প্রাণে অভিষিক্ত করেছিল এবং ভারতকে গৌরবের জয়টীকা পরিয়েছিল, আজ সেই বৌদ্ধধর্ম তার জন্মভূমি ভারতে অবলুপ্ত হয়ে

একান্তে লীন হয়ে আছে—ভাবতেই তাঁর অন্তর বেদনায় ভরে উঠে। পুণ্যতীর্থে দাঁড়িয়ে তিনি মনে মনে সংকল্প করেন—ভারতে আবার বুদ্ধমহিমা প্রচারের জন্য আপনার জীবন উৎসর্গ করবেন। এই সংকল্প তাঁর মধ্যে নতুন প্রেরণা সৃষ্টি করে। তীর্থভ্রমণের পর তাঁর অন্তরে যে ভাবস্রোত বয়ে চলে, তা একমাত্র অন্তর্যামী ছাড়া কেউ অনুমান করতে পারেন নি। তখন গুরুর সঙ্গে আরও কিছুকাল থেকে তাঁরই নির্দেশে কৃপাশরণ বাক্‌খালী নামক একটি গ্রামের বৌদ্ধবিহারে বাস করতে যান। ভারতে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের সংকল্প যাঁর অন্তরকে দিবারাত্রি আলোড়িত করে, গ্রাম্য বিহারের ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে তিনি কি আবদ্ধ থাকতে পারেন? সেই সময়ে তাঁর স্নেহশীলা জননী ইহলীলা সংবরণ করেন। মমতার এক দুশ্ছেদ্য বন্ধন যেন তাঁর খসে পড়ে। এর অল্পকাল পরেই তিনি কলকাতা প্রবাসী বৌদ্ধগণ কর্তৃক কলকাতার বিহারে অবস্থানের জন্য নিমন্ত্রিত হন। আপনার সংকল্প পরিপূরণের স্বপ্নে বিভোর হয়ে তিনি কলকাতায় পদার্পণ করেন।

এই জনবহুল নগরীতে এসে তাঁর এক অনাদৃত কোণে বৌদ্ধবিহার নামক একটি জীর্ণ সংকীর্ণ ঘরে তিনি অবস্থান করতে থাকেন। তিনি যে স্বপ্ন নিয়ে এখানে আসেন, সেই স্বপ্নের সঙ্গে বাস্তবের কোন যোগ নেই—এটা বুঝতে তাঁর বিলম্ব হয় নি। তিনি অনুভব করেন—এখানকার সকলেই কর্মব্যস্ত, কর্মই যেন এখানে লোকের সর্বস্ব, কর্মের কোথাও ফাঁক নেই, তিনি যেন এক কর্মময় জগতে এসে পড়েছেন; এখানে ধর্ম নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না, ধর্ম যেন একটি আনুষ্ঠানিক ব্যাপারে পরিণত হয়ে সসংকোচে সভয়ে মঠ মন্দিরের অন্ধকার কোণে পড়ে আছে। সুতরাং এতাদৃশ স্থানে তাঁর মত রিক্ত সন্ন্যাসীর ধর্মকথা শুনবে কে? তথাপি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কৃপাশরণ হতাশ হন নি। এই সময়েই তাঁর আশ্রয়স্থল সেই জীর্ণ বিহারখানি সরকারের কৃপাকটাক্ষপাতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। যাঁর অন্তরে হতাশার স্থান নেই, সংকল্পের বিপর্যয় নেই, তিনি কি এই আকস্মিক বিপৎপাতে বিচলিত হতে পারেন? এই ঝড় ঝঞ্ঝার মধ্যে তিনি শালবৃক্ষের মত অচল অটল থেকে তাঁর দায়কবর্গকে আশ্বাস দেন এবং তাঁহাদের আর্থিক সাহায্যে বো স্ট্রীটে একখানি ছোট বাড়ী ভাড়া করে মহানগর বিহার নাম দিয়ে সেখানে বৌদ্ধধর্মের আলোচনা শুরু করেন। কিন্তু তাঁর সেই আলোচনা শুনবার লোক কোথায়? তথাপি তিনি ক্ষান্ত হবার পাত্র নন, বৌদ্ধদের বাড়ী বাড়ী গিয়ে ধর্মবাণী শোনাতে থাকেন। বৌদ্ধগণ তাঁর অমায়িক ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে বিহারে যাতায়াত আরম্ভ করেন। তিনি তাঁদের নিয়ে ১২৯৮ সালে আশ্বিনী পূর্ণিমায় বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা নামে একটি সমিতি স্থাপন করেন।

যখন ধর্মাঙ্কুর সভা স্থাপিত হয়, তখন কৃপাশরণের এই চেষ্টাকে অনেকেই উপহাস করে, বিদ্রূপাত্মক বলে মনে করে। কিন্তু তিনি 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন' এরূপ দৃঢ় সংকল্প নিয়ে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। তিনি অনুভব করেন যে-বিরাট বটবৃক্ষ শত শত শ্রান্ত জনকে ছায়াদান করে এবং অগণিত বিহঙ্গমের আশ্রয়স্থল হয়, তার উদ্গম

অতি ক্ষুদ্র বীজ হতে, যে-বিশাল নদী শত শত নগর জনপদ সমৃদ্ধ করে নিঃসীম সমুদ্রে আপনাকে হারায়, তার উৎপত্তিস্থল একটি ক্ষুদ্র ধারামাত্র; অতএব তাঁর ধর্মাঙ্কুর আজ যতই ক্ষুদ্র, উপেক্ষণীয় ও হাস্যাস্পদ হোক না কেন, একদিন এই অঙ্কুর মহামহীরূহে পরিণত হয়ে আপন মহিমায় বিশ্বজনকে মুগ্ধ করবে। সুতরাং লোকের বিদ্রূপ বান, সম্মুখের বিস্তর বাধাবিপত্তি তাঁকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করতে পারে নি। ধৈর্য ও দৃঢ় পরাক্রম নিয়ে তিনি আপনার লক্ষ্যপথে অগ্রসর হতে থাকেন।

ধর্মাঙ্কুরের শ্রীবৃদ্ধির জন্য কৃপাশরণের চেষ্টার বিরাম নেই, পরিশ্রমের সীমা নেই।

এভাবে বৎসরের পর বৎসর অতিবাহিত হয়; তথাপি তাঁর প্রাণান্ত শ্রমের কোন সুফল দেখা দেয় নি, সফলতার কোন লক্ষণ প্রকাশ পায় নি। তৎসত্ত্বেও তিনি হতাশ হন নি, ধৈর্য হারান নি। বরং তিনি বিপুলতর উদ্যমে আপনার কর্মে আত্মনিয়োগ করেন। এই সময় তাঁর অন্যতম ভক্ত গোলাপ সিংহ চৌধুরী সকল ভাবে তাঁর সহায়তা করেন। তিনি জনসাধারণ হতে দানস্বরূপ যা পেতেন, তার একটি কপর্দ্দকও নিজের জন্য ব্যয় না করে ভিক্ষালব্ধ অন্নে জীবন প্রতিপালন করতেন। এইভাবে তিনি কয়েক সহস্র টাকা সঞ্চয় করেন।

এই ছয় বৎসর কাল শুধু ধর্মাঙ্কুরের কার্যেই তাঁর কর্মপদ্ধতি সীমাবদ্ধ ছিল না, তিনি নানাভাবে বৌদ্ধধর্মের প্রচার ও প্রসারের চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকেন। তখন এলাহাবাদে অল্পসংখ্যক বৌদ্ধ পরিবার উপযুক্ত উপদেষ্টার অভাবে স্বধর্মচ্যুত হয়ে বিপথগামী হয়। তাদের দুর্দশার কথা শুনে কৃপাশরণের উদার হৃদয় কেঁপে উঠে। তিনি ১২৯৮ সালে মাঘ মাসের দারুণ শীতে এলাহাবাদের দিকে রওনা হন। তথায় পৌঁছে তিনি সেই নীতিভ্রষ্ট বৌদ্ধদের বাড়ীতে বাড়ীতে গিয়ে তাদের উপদেশ দিতে থাকেন। তারা তাঁর সরল অমায়িক ব্যবহারে এবং চরিত্রের মহিমায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে গুরুবরণ করে। সেই হতে তারা তাঁরই নির্দেশ শিরোধার্য করে সুশৃঙ্খল জীবনযাপনে বদ্ধপরিকর হয়।

সেই যুগে বৌদ্ধদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুণ্যতীর্থ—তথাগতের পরিনির্বাণস্থানের অবস্থিতি নিয়ে প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে বাদানুবাদ চলতে থাকে। কৃপাশরণ এই বিষয়ে অত্যন্ত সজাগ হন। ভারত সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ যখন সকল বাদানুবাদের অবসান ঘটিয়ে গোরক্ষপুর জেলার কুশীনগর নামক স্থানে তথাগতের পরিনির্বাণ স্থান আবিষ্কার করে, তখন তাঁর হৃদয় আনন্দে নেচে উঠে। তিনি অবিলম্বেই তাঁর শিক্ষাগুরু মহাবীর মহাস্থবিরের সঙ্গে সেই দিকে যাত্রা করেন। তথায় পৌঁছে তাঁরা দেখেন—ভগবান বুদ্ধের সিংহশয্যায় শায়িত মূর্তি ভগবানের পরিনির্বাণের অবস্থা সূচনা করছে। অদূরেই সম্রাট অশোকের শিলালিপি তার সাক্ষ্য বহন করে দাঁড়িয়ে আছে; চারদিক বনাচ্ছন্ন, কোথাও মনুষ্য বসতির চিহ্ন নেই। চির অভিলষিত পরিনির্বাণ পীঠ দেখে ভক্ত কৃপাশরণের আনন্দাশ্রু উদ্‌গত হয়। ভাবে, ভক্তিতে, পূজায়, বন্দনায় তথায় কয়েকদিন অতিবাহিত করে পরিপূর্ণ

হৃদয়ে তিনি কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং এই নতুন তীর্থস্থানের আবিষ্কার বার্তা বৌদ্ধজগতে প্রচার করে দেন।

এর কিছুকাল পরে তিনি সংবাদ পান লক্ষ্ণৌ শহরে মুষ্টিমেয় বৌদ্ধ পরিবার আছে, কিন্তু তারা বৌদ্ধগুরুর অভাবে নিজেরা কোন ধর্মাবলম্বী তা পরিষ্কার করে বলতে পারে না এবং তাদের আচার পদ্ধতি অত্যন্ত কুসংস্কারপূর্ণ। এই পতিত বৌদ্ধগণের দুরবস্থার কথা শুনে তাঁর হৃদয় ব্যথিত হয়। তিনি আপনার সকল কর্তব্য স্থগিত রেখে ১২৯৯ সালে ফাল্গুন মাসে লক্ষ্ণৌ যাত্রা করেন। তাঁর উপস্থিতিতে তথাকার বৌদ্ধগণের মধ্যে নতুন সাড়া পড়ে যায় এবং তারা তাঁর কথায় আচরণে মুগ্ধ হয়। তাঁর সরল কথায় বৌদ্ধধর্মের সার মর্ম উপলব্ধি করে চিরাচরিত কুসংস্কার প্রথা বর্জন করে এবং স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত হয়ে তাঁক গুরু রূপে বরণ করে নেয়। উত্তরকালে তাদেরই সহায়তায় তিনি লক্ষ্ণৌ নগরে যে ধর্মশিখা প্রজ্জ্বলিত করেন, তা উজ্জ্বল হতে উজ্জ্বলতর হয়ে বৌদ্ধধর্মের বিপুল আলোক বিকীর্ণ করে। পরবর্তী আলোচনায় তা প্রকট হবে।

কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করে তিনি ধর্মাঙ্কুরের উন্নতিসাধনে আত্মনিয়োগ করেন। এই সময় পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা রাজকুমার ভুবনকুমার রায় ও রমণীমোহন রায় অধ্যয়নার্থ কলকাতায় আগমন করেন। এই রাজকুমারদ্বয়ের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। এই পরিচয়ের সূত্র ধরে তাঁরা তাঁর অনুরাগী ভক্ত হয়ে পড়েন। সেই থেকেই তাঁর সঙ্গে তাঁদের কাছে অমূল্য হয় এবং তিনিও তাঁদের অত্যন্ত স্নেহ করতে থাকেন।

১৩০৪ সালে ২৫শে বৈশাখ কুমার ভুবনমোহন রায় তাঁর পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত হন। কৃপাশরণ সেই অভিষেক সভায় আমন্ত্রিত হয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙ্গামাটিস্থিত রাজবাটীতে পদার্পণ করেন। অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি নবাভিষিক্ত রাজাকে আশীর্বাদ করেন। অতঃপর সমবেত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। সেই সূত্রে তিনি তাঁর কর্মক্ষেত্রের প্রতি তথাকার বহুলোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কলকাতায় ফিরে তিনি যথারীতি বর্ষাব্রত সমাপন করে কলকাতা প্রবাসী বৌদ্ধ ছাত্রদের সহায়তায় এবং গোলাপ সিংহ চৌধুরীর অর্থানুকূল্যে বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভার ষষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশন সমাপ্ত করেন।

দুই

১৩০৫ সাল। তখন কৃপাশরণের বয়স বত্রিশ বৎসর। এই সময় কি জানি কেন তাঁর মন অবসাদগ্রস্ত হতে থাকে। তাঁর কর্মধারায় হঠাৎ ভাটা পড়ে। তাঁর অলস অন্তঃকরণ কল্পনার রঙীন পাখা ভর করে স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করতে থাকে। বর্ষার আকাশের প্রান্তে উদ্ভূত ক্ষুদ্র মেঘ যেমন ক্রমে বৃহদাকার ধারণ করে সমস্ত আকাশকে ছেয়ে ফেলে, তাঁর মনের কোণে সঞ্চিত মোহকণা সেইরূপ ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হয়ে তাঁর সমগ্র সত্তাকে অভিভূত করে। কৃপাশরণ যেন পূর্বের সেই কৃপাশরণ নন। যে ভোগপিপাসা তাঁর কাছে এতদিন পরাজয় স্বীকার করেছে তা আজ তাঁর অন্তরে উদ্দাম হয়ে উঠেছে। যে সন্ন্যাস ব্রতে দীক্ষিত হয়ে আপনার মহত্তম লক্ষ্যের পানে তিনি অগ্রসর হয়েছেন, আজ তা তাঁর পায়ে যেন কঠিন শৃঙ্খল হয়ে আবদ্ধ হয়েছে। তিনি ভাবেন "চীবর দিয়া কেন আপনাকে ঢেকেছি? কেন ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়েছি? এই সব দিয়া আড়াল রচনা করে আপনাকে বঞ্চিত করছি কেন? এভাবে ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করে সন্ন্যাসে আমার লাভ কি?" তিনি সংকল্প করেন—চীবর ত্যাগ করে পাত্র চূর্ণ করে সংসারে দশজনের মত সংসারসুখে লিপ্ত হবেন। তখন তাঁর অন্তর হতে কে যেন বলে উঠে—"কৃপাশরণ, তুমি চলেছ কোথায়?" তাঁর অন্তরের এই প্রশ্নে তাঁর অন্তর কেঁপে যায়, সন্ন্যাসত্যাগে বাধা পড়ে। তখন গুরুর গূঢ় মন্ত্র তাঁর স্মৃতিতে ভেসে উঠে, বোধিদ্রুম মূলে দাঁড়িয়ে ভারতে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের সংকল্পের কথা মনে পড়ে। তাঁর অন্তরে রাম-রাবণের যুদ্ধ বেধে যায়। একদিকে তাঁর গুরুমন্ত্রপূত কর্মমুখর সন্ন্যাস, অপরদিকে আপাতমধুর সংসারের আকর্ষণ। এই অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হয়ে কৃপাশরণ কয়েক মাস কাটিয়ে দেন।

এই সময় প্রবল অশান্তির ঝড় তাঁর অন্তরে বইতে থাকে। একটি উদ্বিগ্নভাব দুঃস্বপ্নের মত তাঁর উপর যেন চেপে বসে। তাঁর উৎসাহ উদ্যম নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। দর্শকের স্থূল দৃষ্টিতেও প্রতিভাত হয়—তাঁর মন সুর ছন্দ হারিয়ে কোথায় যেন আড়ষ্ট হয়ে আছে। তীক্ষ্মধী মহাবীর মহাস্থবির কলকাতায় এসে শিষ্য কৃপাশরণের অন্তরের অবস্থা অনুমান করেন। এ সম্বন্ধে তিনি কোন বাক্যালাপ না করে শিষ্যকে নিজের সঙ্গে বুদ্ধগয়া যেতে আদেশ দেন। গুরুর আদেশ শিরোধার্য করে কৃপাশরণ গুরুর সঙ্গে বুদ্ধগয়া যাত্রা করেন। ভগবান বুদ্ধের বুদ্ধত্ব লাভের ভূমির বোধিদ্রুমমূলে দাঁড়িয়ে একদিন কৃপাশরণ ভারতে বুদ্ধ মহিমা প্রচারের প্রতিজ্ঞা করেন, সেই বোধিদ্রুমমূলে উপনীত হয়ে তিনি লুটিয়ে পড়েন। তাঁর নীরব অশ্রুধারায় বোধিমূল সিক্ত হতে থাকে। সেই অশ্রুবন্যা যেন তাঁর মনে কলুষ গ্লানি ভাসিয়ে নিয়ে যায়। অননুভূত আনন্দে ও স্নিগ্ধ শান্তিতে তাঁর হৃদয় ভরে উঠে। কৃপাশরণ অনুভব করেন ভগবানের করুণাকণা তাঁর উপর ঝরে পড়েছে এবং অন্তর্দ্বন্দ্বে তাঁর জয়লাভ হয়েছে। তখন তিনি অকপট

ভাষার গুরুর নিকট সমস্ত ব্যক্ত করেন। গুরু তাঁকে আশীর্বাদ করে বলেন "কৃপাশরণ, কোন বাধা তোমার পথরোধ করতে পারবে না; তুমি আত্মস্থ হয়ে তোমার লক্ষ্যপথে অগ্রসর হও।" অতঃপর তিনি গুরুর সঙ্গে বৌদ্ধদের পুণ্যতীর্থ কুশীননগর প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করে কলকাতায় ফিরে আসেন।

অবরুদ্ধ জলস্রোত যেমন বাঁধ ভাঙলে অপ্রতিহত গতিতে প্রবাহিত হয়, কৃপাশরণের অবরুদ্ধ উৎসাহ উদ্যম সেইরূপ উদ্দামভাবে জনসমাজের কল্যাণে আবার ধাবিত হয়। কলকাতায় প্রত্যাবর্তনের পর থেকেই তাঁর কর্তব্যের অবধি নেই। তিনি বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভার কার্যে ও নানা জনহিতকর অনুষ্ঠানে সম্পূর্ণ ভাবে আত্মনিয়োগ করেন। এই সময় কয়েক সহস্র টাকা তাঁর সঞ্চিত থাকে। তিনি মনে মনে ভাবেন যে অর্থ তাঁর জীবনে অনর্থ ঘটাতে চেয়েছে, সে অর্থকে হাতে রাখা উচিত হবে না। অতএব তিনি তা সৎকর্মে ব্যয় করবার সংকল্প করেন। তখন বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা ও বিহারের নিজস্ব গৃহ ছিল না এবং কলকাতায় যাত্রীনিবাসের অভাবে নানা দেশাগত বৌদ্ধ তীর্থযাত্রীদের বিশেষ অসুবিধা ভোগ করতে হত। এই দুইটি অভাব পূরণের জন্য তিনি বদ্ধপরিকর হন। কিন্তু তাঁর ক্ষুদ্র অর্থ ভাণ্ডারের দিকে দৃষ্টিপাত করে তিনি বুঝতে পারেন তাঁর আকাশ-কুসুম কল্পনাই করা হয়েছে। তথাপি সংকল্পচ্যুত হওয়ার কথা তাঁর মনে স্থান পায় নি। তিনি ভাবেন তিনি ভিক্ষাজীবি; ভিক্ষাপাত্র তাঁর হাতে আছে, তা সম্বল করেই তিনি তাঁর সাধু সংকল্প পূরণে অগ্রসর হবেন। সত্যসত্যই তিনি অবিলম্বে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে বৌদ্ধদের দ্বারস্থ হন। এই অজ্ঞাত অখ্যাত ভিক্ষুর ভিক্ষাপাত্রে তখন কেউ যৎকিঞ্চিৎ দান করে, কেউ করে না। অবিচলিত ভাবে তিনি ভিক্ষারত হন। এইভাবে অনবরত চেষ্টায় তিনি কিছু অর্থ সংগ্রহ করেন এবং ১৩০৭ সালে জৈষ্ঠ মাসে কলকাতায় বউবাজার অঞ্চলে ললিতমোহন দাস লেনে ৪৫০০ টাকা মূল্যের ৫ কাঠা পরিমিত জমি ক্রয় করেন। এতেই তাঁর সমস্ত টাকা নিঃশেষিত হয়ে যায়। উপরন্তু আরও কিছু ঋণ হয়।

জমি ক্রয়ের পর একদিকে ঋণশোধ অন্যদিকে বিহার ও যাত্রীনিবাস নির্মাণ—এই দু'টি কর্তব্য তাঁর সম্মুখে বড় হয়ে দাঁড়ায়। ইতিপূর্বে অনবরত ভিক্ষায় তিনি বুঝতে পারেন এই কর্তব্য সাধন তাঁর পক্ষে সহজসাধ্য নয়। যদিও তিনি কোথাও কোন আশার চিহ্নমাত্র দেখতে পান নি, তথাপি তিনি নিরাশ না হয়ে তাঁর উদ্দেশ্যসাধনে অগ্রসর হন। এই সময় তাঁর অগ্রজ কৃষ্ণচন্দ্র কলকাতায় আগমন করেন এবং সকলভাবে কনিষ্ঠের মহদনুষ্ঠানে সহায়তা করেন। বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না, ধর্মাঙ্কুরের জমি ক্রয়ের ব্যাপারে পরামর্শ গ্রহণ প্রসঙ্গে কলকাতায় তদানীন্তন রেজিষ্ট্রার ধর্মপ্রাণ প্রতাপচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে কৃপাশরণের পরিচয় হয়। ঘোষ মহাশয় তাঁর আলাপ ব্যবহারে অত্যন্ত মুগ্ধ হন। তখন ঘোষ মহাশয়ের সংসার ত্যাগের সময় আসন্ন —তিনি সংসারত্যাগী হয়ে বিন্ধ্যাচল যাত্রা করবেন। এ জন্য কৃপাশরণের অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করতে না পেরে তিনি আপনার

সুযোগ্য পুত্র ভূপেন্দ্রশ্রী ঘোষকে এই বিষয়ে নির্দেশ দেন। সেই হতে ভূপেন্দ্রশ্রী ঘোষ তাঁর অকৃত্রিম বন্ধুতে পরিণত হন এবং পরবর্তী কালে তাঁর সহায়ক হিসাবে ভারতে বৌদ্ধধর্মের প্রচারে অংশ গ্রহণ করেন।

বলা বাহুল্য, ধর্মাঙ্কুর বিহার ও যাত্রীনিবাস নির্মাণের জন্য যেখানে সহস্র সহস্র টাকার প্রয়োজন, সেখানে মুষ্টি ভিক্ষায় কি হতে পারে? তথাপি কৃপাশরণ দমবার পাত্র নন। তিনি অনুভব করেন—যে কর্তব্যভার তিনি গ্রহণ করেছেন তার ফলাফল তাঁর হাতে নয়; ফলাফলের চিন্তা পরিত্যাগ করে তাঁকে কর্মেই আত্মনিয়োগ করতে হবে। অতএব তিনি তাঁর সম্বল ভিক্ষাপাত্র আবার হাতে গ্রহণ করেন। আটমাস কাল তিনি চট্টগ্রামের গ্রামে গ্রামে এবং আকিয়াবের পাহাড় উপত্যকায় অক্লান্তভাবে ভিক্ষায় রত হয়ে ১৯০০০ টাকা সংগ্রহ করেন এবং কলকাতায় ফিরে আসেন। তা থেকে ঋণ শোধে ১৩০০০ টাকা খরচ হয়ে যায়। সামান্য টাকা হাতে নিয়ে বিহার নির্মাণের কাজ আরম্ভ করা সঙ্গত হবে না ভেবে বিহারের ভিত্তি স্থাপন স্থগিত রাখতে বাধ্য হন।

তখন কলকাতা মির্জাপুর স্ট্রীট অঞ্চলের বিশিষ্ট নাগরিক যদুনাথ ঘোষ এম এ কৃপাশরণের সহিত আলোচনায় পরিতুষ্ট হয়ে বৌদ্ধমতে দীক্ষা গ্রহণের আগ্রহ প্রকাশ করেন। তিনি সস্ত্রীক ঘোষ মহাশয়কে দীক্ষা দান করেন। সেই থেকে তিনি বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য কৃপাশরণের অন্যতম সহায় হন। দীক্ষার এক বৎসর পরেই তিনি বহুমূত্র রোগে ইহলীলা সংবরণ করেন। তাঁর অকাল প্রয়াণে কৃপাশরণ আপনার একজন বিশিষ্ট কর্মী ও সহায় হারান। এই সময়ে ধর্মাঙ্কুর সভা কলকাতা সহরের সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং বৌদ্ধধর্মের প্রচার কেন্দ্ররূপে তার কার্যাবলী অত্যন্ত বৃদ্ধি পেতে থাকে। 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেন কৃপাশরণের সহিত পরিচয়ে তাঁর প্রতি মুগ্ধ হন। তিনি তাঁকে অনাগারিক ধর্মপালের সঙ্গে যুক্তভাবে কাজ করার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু স্বাবলম্বনপ্রিয় আত্মপ্রত্যয়ী কৃপাশরণ এতে সম্মত হন নি এবং নানা যুক্তির সাহায্যে তাঁকে বুঝিয়ে দেন—তাঁদের উভয়ের লক্ষ্য অভিন্ন, সুতরাং তাঁদের স্বতন্ত্র কর্মসাধনা পরিপূর্ণতা লাভ করে একই ক্ষেত্রে এসে স্বচ্ছন্দে মিলিত হবে; অন্যথা অস্বাভাবিক মিলনে কোন সুফল হবে না। এর পর উভয়ে সখ্যতা সূত্রে আবদ্ধ হন।

ভগবান তথাগতের স্মৃতিবিজড়িত ইতিহাস-প্রসিদ্ধ জেতবন অনাথপিণ্ডদাশ্রম দেখবার আকাঙ্খা ভক্ত কৃপাশরণের হৃদয়ে প্রবল হয়ে উঠে। কিন্তু তখন জেতবনের অবস্থিতি রহস্যাবৃত। কেহই তার কোন খবর জানে না। তথাপি তিনি সংকল্প প্রকাশ করেন—তিনি জেতবন দেখবেন। তাঁর এই সংকল্প কারও অনুমোদন লাভ করে নি। কারণ, সহায় সম্বলহীন হয়ে শুধু মনের আবেগে বিপদ-সংকুল অভিযান করে বিপদ বরণ করাকে তাঁর হিতৈষীরা যুক্তিসংগত মনে করেন নি। শৈশব থেকেই তাঁর মনের একটি একরোখা ভাব

ছিল; যখন যা তাঁর মনকে পেয়ে বসত, তখন তার শেষ না দেখে তিনি ক্ষান্ত হতেন না। এই ক্ষেত্রেও তার অন্যথা হয় নি। লোকের বারণ সত্ত্বেও তিনি ১৩০৮ সালে পৌষমাসে বৌদ্ধশাস্ত্রের ভৌগোলিক নির্দেশ অনুসরণ করে নেপালাভিমুখে যাত্রা করেন। তিনি দুর্গম পথে অনেক কষ্ট ও শ্রম স্বীকার করে নেপাল রাজ্য এবং বলরামপুর রাজ্যের মধ্যবর্তী ভূ-ভাগে সাহেৎ মাহেৎ নামক এক শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যময় স্থানে উপস্থিত হন। সেখানে বিরাট সঙ্ঘারামের ধ্বংসাবশেষ ও অসংখ্য ভগ্ন স্তূপ দেখে তাঁর প্রতীতি হয়—তাঁর অভিযান সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে অর্থাৎ তিনি আপনার চিরাভিলষিত জেতবনে এসে পৌঁচেছেন। এইটিই যে জেতবন সে সম্বন্ধে তাঁর সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না। এই আবিষ্ক্রিয়ায় তাঁর হৃদয় পুলকে নেচে উঠে। তিনি স্মৃতিভারাবনত চিত্তে সমস্ত পরিদর্শন করেন এবং ভগবানের বাসকুটিরের সম্মুখে বসে উপাসনায় রত হন। বলা বাহুল্য, এই পুণ্য তীর্থ আবিষ্কারের জন্য বৌদ্ধ জগৎ তাঁর কাছে বিশেষ ভাবে ঋণী। ইহা আজ বৌদ্ধদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তীর্থে পরিণত হয়ে প্রতি বৎসরের শরৎ ঋতুতে নানাদেশাগত তীর্থযাত্রিগণের আলাপ-গুঞ্জনে মুখরিত হয়ে উঠে। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য—চট্টগ্রাম কক্সবাজারের সুপ্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী মংখেজারী কৃপাশরণের এই অভিযানের ব্যয়ভার বহন করেন।

নানা কার্যে ব্যাপৃত থাকায় বিহারের জন্য চাঁদা সংগ্রহ দীর্ঘকাল বন্ধ থাকে এবং বিহারের ভিত্তি স্থাপনে বিলম্ব ঘটে। এই সব ব্যাপারে তাঁকে নিশ্চেষ্ট ও উদ্যমহীন মনে করে কেউ কেউ তাঁর সাধুকার্য ও সদুদ্দেশ্যের প্রতি সন্দিহান হয়। তাঁর বিরুদ্ধে নানারকম অপ্রিয় আলোচনা উঠে। লোকের নিন্দা-প্রশংসায় উদাসীন কৃপাশরণ এতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নি। বলা বাহুল্য, তিনি বার বার ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে নিয়েও আশানুরূপ অর্থ সংগ্রহ করতে পারেন নি। অর্থের অভাবে তাঁর কার্যে অবাঞ্ছিত বিলম্ব ঘটতে থাকে। এই জন্য তাঁর অনিশ্চিত জীবনের আরব্ধ কার্য অসমাপ্ত থেকে যাবে ভেবে তিনি ব্যথিত হন। তখন তিনি অর্থের জন্য বার বার আবেদন করেন। কোন দিক হতে কোন সাড়া আসে না। তবুও তিনি হতাশ না হয়ে অর্থসংগ্রহের জন্য ১৩০৮ সালে চৈত্রমাসে চট্টগ্রাম যাত্রা করেন। তথায় গ্রাম গ্রামান্তরে ভিক্ষা করতে করতে চট্টগ্রামের চাকমারাজের আবাসভূমি রাজনগরে উপস্থিত হন। তখন তাঁর উপাধ্যায় সঙ্ঘগুরু মহাত্মা পূর্ণাচার শিষ্যবৃন্দ পরিবৃত হয়ে তথাকার শাক্যমুনি মন্দিরে অবস্থান করেন। আপনার প্রিয়শিষ্যের আকস্মিক উপস্থিতিতে সঙ্ঘগুরু পূর্ণাচার অত্যন্ত আনন্দিত হন। বলা বাহুল্য, তিনি কৃপাশরণের মধ্যে সদ্ধর্মে অনুরাগ, কর্তব্যনিষ্ঠা প্রভৃতি সদ্‌গুণের সমাবেশ দেখে তাঁর প্রতি বরাবর প্রসন্ন থাকেন। এই গুণাবলীর জন্য তাঁকে 'মহাস্থবির' পদের প্রকৃত অধিকারী বিবেচনা করে সঙ্ঘগুরু বহুদিন আগে তাঁর যোগ্য সম্মান দানের সংকল্প পোষণ করেন। এবার সুযোগ লাভ করে তিনি শাক্যমুনি মন্দির প্রাঙ্গণে সঙ্ঘসভা আহ্বান করেন। সেই সভায়

চট্টলের বিশিষ্ট ভিক্ষুবর্গ সমবেত হন। প্রশস্ত মন্দির-প্রাঙ্গন দর্শনার্থী লোকে লোকারণ্য হয়ে যায়। অতঃপর সঙ্ঘগুরু জনতার কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টির সম্মুখে সুসজ্জিত মণ্ডপে মঙ্গলাচরণ করে শিষ্য কৃপাশরণকে 'মহাস্থবির' পদে অভিষিক্ত করেন। কৃপাশরণ নানাদিক থেকে বহু অভিনন্দন পত্রে অভিনন্দিত হন।

অতঃপর মহাস্থবির কৃপাশরণ চট্টগ্রামের নানা স্থান ভ্রমণ করে ১৫০০০ টাকা চাঁদা সংগ্রহ করে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁর মহাস্থবির পদ প্রাপ্তিতে তাঁর সংবর্দ্ধনার জন্য এক অভিনন্দন সভার অধিবেশন হয়। বহু ভক্ত ও বন্ধু সম্মিলিত হয়ে তাঁকে অভিনন্দিত করেন। সেই সভায় ধর্মপ্রাণ সুপণ্ডিত গুণালঙ্কার স্থবিরও উপস্থিত হন। তিনি মহাস্থবিরের কার্যাবলীর ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং তাঁর সহযোগিতা করবার সংকল্প প্রকাশ করেন। এই উদার সহৃদয়তায় জন্য কৃপাশরণ তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। এখানেই উভয়ের বন্ধুত্বের সূত্রপাত হয়। সেই থেকে কৃপাশরণের দক্ষিণ হস্তরূপে গুণালঙ্কার বৌদ্ধধর্ম ও সমাজের সেবায় জীবন উৎসর্গ করেন।

তিন

১৩১০ সালে কৃপাশরণের কর্ম জীবনের নতুন পর্ব শুরু হয়। তাঁর সম্মুখের বাধাবিপত্তি যেন ক্রমশঃ অপসৃত হতে থাকে। তিনি নতুন উদ্যমে আবার চাঁদা সংগ্রহের জন্য বের হন। এইবার এই ব্যাপারে তাঁর অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ নতুন। আগে যেখানে তাঁকে বার বার ব্যর্থমনোরথ হয়ে ফিরে আসতে হয়েছে, সেইখানেও তাঁর জন্য দ্বার উন্মুক্ত। লোক তাঁর ভিক্ষাপাত্রে কিছু দিতে পারলেই যেন কৃতার্থ। অল্প সময়ের মধ্যে অনায়াসে কয়েক সহস্র টাকা তাঁর হাতে আসে। তিনি উপযুক্ত সময় বিবেচনা করে সেই বৎসরেই ললিতমোহন দাস লেনে ক্রীত জমির উপর ধর্মাঙ্কুর বিহারের ভিত্তি স্থাপন করেন এবং বিহারের নির্মাণ কার্য আরম্ভ করে দেন। তাঁর পরম হিতৈষী বন্ধু ভূপেন্দ্রশ্রী ঘোষ আপনার ক্ষতি ও শ্রম স্বীকার করে এই কার্যে বিশেষভাবে সহায়তা করেন।

বিহার নির্মাণের কার্য দ্রুত অগ্রসর হতে থাকে। নির্মাণ কার্য আরম্ভ হবার কিছু কাল পরেই অর্থসংকট উপস্থিত হয়। কৃপাশরণ উপায়ান্তর না দেখে চাঁদা সংগ্রহের জন্য বের হন এবং নানা স্থান ভ্রমণ করে পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্যতম রাজা নিপ্রুচাইং বাহাদুরের মানিকছড়িস্থিত রাজবাটিতে আতিথ্য গ্রহণ করেন। সেখান থেকে আমতলির গিরিশচন্দ্র দেওয়ান মহাশয়ের বাড়ীতে এসেই পীড়িত হয়ে পড়েন। চিকিৎসা সত্ত্বেও ক্রমশঃ তাঁর রোগ বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই অবস্থায় তিনি চট্টগ্রাম শহরে নীত হন। সেখানে তাঁর রোগের অবস্থা দিনের পর দিন শোচনীয় হতে শোচনীয়তর হয়ে উঠে এবং জীবন-সংশয় উপস্থিত হয়। তিনিও জীবনের আশা পরিত্যাগ করেন। তাঁর অকাল মৃত্যুর জন্য তাঁর আরব্ধ কার্য অসমাপ্ত থেকে যাবে—একথা ভাবতেই তাঁর অন্তর ব্যথায় ভরে উঠে। এই ভাবনা তাঁর রোগ যন্ত্রণা অপেক্ষা পীড়াদায়ক হয়। তিনি ভাবেন—জগতের কিছুই মানুষের ইচ্ছা নিয়ন্ত্রিত নয়, অনর্থক বিব্রত হয়ে লাভ কি? তখন তাঁর দৃষ্টি পড়ে তাঁর পরম বন্ধু গুণালঙ্কারের উপর যিনি তাঁর কর্তব্যভার গ্রহণ করতে পারেন। তিনি লোক মারফত তাঁর রোগের অবস্থা জানিয়ে গুণালঙ্কারকে চট্টগ্রাম শহরে আসবার জন্য অনুরোধ করেন। বন্ধুর রোগ সংবাদ পেয়ে গুণালঙ্কার তৎক্ষণাৎ শহরের দিকে হওনা হন। তথায় পৌঁছে তিনি বন্ধুর রোগশয্যার পাশে বসে তাঁকে আশ্বাস দেন। কৃপাশরণ আপনার রোগশীর্ণ হাতখানি প্রসারিত করে ক্ষীণ কণ্ঠে বলেন—"ভাই, পরম আশ্বাস আমি পেয়েছি, আমার অসমাপ্ত কার্যের ভার এইবার তুমি লও।" এই বলে তিনি একবার চোখ বুজেন। আবার তিনি চোখ মেলে বলেন—"নিজের ইচ্ছায় কিছু হয় না, অনেক কতর্ব্যই বাকী রয়ে গেল।" তাঁর কথায় গুণালঙ্কারের চোখ অশ্রুপূর্ণ হয়ে উঠে। তিনি আপনাকে সামলিয়ে বলেন—"ভাবনার কোন কারণ নেই, তথাগতের কৃপায় আপনি শীঘ্রই সেরে উঠবেন।" সত্য সত্যই তথাগতের কৃপায় কয়েক দিন পরেই তাঁর রোগের অবস্থা হঠাৎ উপশমের দিকে পরিবর্তিত হয়। দেখতে দেখতে তিনি সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করেন।

রোগমুক্তির পর গুণালঙ্কারের সহৃদয় আহ্বানে তিনি রোগশীর্ণ দেহে কর্ণফুলির তীরস্থিত শীলক নামক গ্রামে পদার্পণ করেন। তথায় বন্ধুর আন্তরিক যত্ন ও সেবায় তিনি মাসেক কালের মধ্যে অনেকখানি সুস্থতা লাভ করেন। কিন্তু তখনও পূর্বের স্বাস্থ্য তিনি ফিরে পান নি। এই অবস্থায় যদিও অধিক দিন বিশ্রাম দরকার, তথাপি তিনি আপনার কর্তব্য স্থগিত রেখে বিশ্রামের চিন্তাও মনে স্থান দিতে পারেন নি। অতএব তিনি আপনার প্রিয় বন্ধু গুণালঙ্কারকে ধর্মাঙ্কুরে পাঠিয়ে দিয়ে চাঁদা সংগ্রহের জন্য ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়ে রেঙ্গুন যাত্রা করেন। তথায় পৌঁছে ব্রহ্মদেশের নানা স্থান ঘুরে তিনি অর্থ সংগ্রহ করতে থাকেন। এইভাবে কয়েক মাস কাটিয়ে দিয়ে তিনি যখন কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন, তখন ধর্মাঙ্কুর বিহারের নির্মাণকার্য অনেকখানি অগ্রসর হয়। অর্দ্ধনির্মিত বিহারে তিনি বর্ষাব্রত অবলম্বন করেন। এই সময় পূর্ণচন্দ্র বড়ুয়া নামে চট্টগ্রামের এই উচ্চশিক্ষিত তরুণ তাঁর নিকট সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষিত হন। ইনি উত্তরকালে স্বামী পূর্ণানন্দ নামে পরিচিত হয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন।

ধর্মাঙ্কুর বিহারের নির্মাণকার্য সমাপ্ত হবার পর ধর্মাঙ্কুর সভা সেখানেই স্থানান্তরিত হয়। অল্পকালের মধ্যেই এই প্রতিষ্ঠানের প্রতি মনীষীবৃন্দের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। বগুরার নবাব আবদুল শোভাহান চৌধুরী এবং মহামনীষী হরিনাথ দে কৃপাশরণের কার্যাবলী দেখে অত্যন্ত মুগ্ধ হন। সেই থেকেই তাঁরা ধর্মাঙ্কুর সভার পৃষ্ঠপোষকতা করেন। পূর্বে ধর্মাঙ্কুর সভা বিশেষভাবে বৌদ্ধ আনুষ্ঠানিক ব্যাপারেই সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু এর পর তার প্রত্যেক অধিবেশনে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সম্মিলিত হয়ে বুদ্ধের জীবন ও বাণীর আলোচনা করেন। এইরূপে এই প্রতিষ্ঠান একটি বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে পরিণত হয়। বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না, এর প্রতি অচিরেই স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। তিনি কৃপাশরণের সহিত প্রথম পরিচয়েই তাঁর গুণমুগ্ধ হন। সেই থেকেই উদারহৃদয় স্যর আশুতোষ আজীবন ধর্মাঙ্কুরের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। এই পরিচয়ের ফল শুধু এইখানে সীমাবদ্ধ থাকেনি, তিনি নানাভাবে বৌদ্ধসমাজের হিতসাধন করেন এবং বৌদ্ধসাহিত্য প্রচারে অগ্রণী হন। এই প্রসঙ্গে তাঁর বক্তৃতার একটি অনুচ্ছেদ নিম্নে উদ্ধৃত করলাম:

"আপনারা আমার প্রশংসা করছেন যে আমি বৌদ্ধ সাহিত্য প্রচারে সাহায্য করেছি। এর মূলে শুধু মহাস্থবির মহোদয়ের সঙ্গে আমার পরিচয়। তাঁর সঙ্গে পরিচয়েই বৌদ্ধধর্মের প্রতি ও বৌদ্ধসাহিত্যের প্রতি আমার মনোযোগ আকৃষ্ট হয়।"

১৩১২ সালে পৌষ মাসে তিব্বতের পরাক্রমশালী ধর্মগুরু তাসিলামা ভারতে তীর্থভ্রমণ উপলক্ষে কলকাতায় আগমন করেন। মহাস্থবির তাঁকে নিমন্ত্রণ করে ধর্মাঙ্কুর বিহারে সংবর্দ্ধিত করেন। সেই সংবর্দ্ধনা সভায় স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, সারদাচরণ মিত্র, হরিনাথ দে প্রমুখ কলকাতায় বিশিষ্ট নাগরিকগণ সমবেত হন। এর অব্যবহিত পরে কৃপাশরণ নিমন্ত্রিত হয়ে গুণালঙ্কারের সঙ্গে প্রিন্স অব্ ওয়েল্সের দরবারে উপস্থিত হয়ে তাঁর মঙ্গল কামনা

করেন। সেই থেকে ক্রমশঃ বৌদ্ধধর্মাঙ্কুর সভা ও বিহার কলকাতার জনসমাজে বিশেষভাবে পরিচয় লাভ করে এবং কৃপাশরণের খ্যাতিও সঙ্গে সঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে। এই সময় তাঁর অগ্রজ কৃষ্ণচন্দ্র কনিষ্ঠের সদনুষ্ঠানে আত্মোৎসর্গ করে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুতে কৃপাশরণ একজন নিষ্ঠাবান কর্মী হারান।

ক্রমাগত ভ্রমণ ও গুরুতর পরিশ্রমে কৃপাশরণের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে। চিকিৎসকগণ তাঁকে কিছু দিনের জন্য বিশ্রাম করতে পরামর্শ দেন। তাঁদের বিধান মতে তিনি বিশ্রাম নিতে বাধ্য হন। এ সময় ত্যাগব্রতী শাস্ত্রজ্ঞ কালীকুমার ভিক্ষু স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে কৃপাশরণের সহযোগিতা করতে প্রবৃত্ত হন এবং ধর্মাঙ্কুরের কার্যভার গ্রহণ করেন।

কিছুকাল বিশ্রামের পর কৃপাশরণ লক্ষ্ণৌ শহরে একটি মহাসম্মেলন আহ্বান করেন। তথাকার বিশিষ্ট নাগরিকগণ তাতে সমবেত হন। তিনি সেই সম্মেলনে লক্ষ্ণৌ শহরে একটি বৌদ্ধবিহার স্থাপনের সংকল্প প্রকাশ করেন। তা সমবেত জনতা কর্তৃক সম্যকভাবে অনুমোদিত হয়। তাঁর অনাড়ম্বর ধর্মজীবন ও কর্মপ্রেরণায় মুগ্ধ অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁর সাধুকার্যে সহায়তা করতে প্রতিশ্রুত হন। বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না—তিনি যখন এই সংকল্প প্রকাশ করেন, তখন তা কার্যে পরিণত করবার সুযোগ সুবিধা বলতে কিছুই তাঁর ছিলনা। কিন্তু তাঁর হৃদয়ে আছে বল, মনে আছে ধৈর্য এবং প্রাণে আছে অদম্য কর্মপ্রেরণা। বাধা বিপত্তি দেখে পশ্চাদ্‌পদ হবার পাত্র তিনি নন।

শুভকর্ম সম্পাদনে কাল-বিলম্ব করতে নেই। তাতে শুধু মনের দ্বিধা দ্বন্দই বৃদ্ধি পায়। এইজন্য তিনি তাঁর সংকল্প কার্যে পরিণত করবার উপায় খুঁজতে থাকেন। এই প্রসঙ্গে তিনি আপনার প্রিয় সহচর মহাস্থবির গুণালঙ্কারকে সঙ্গে নিয়ে লক্ষ্ণৌএর তদানীন্তন ডিঃ কমিশনার মিঃ বাটলারের সহিত সাক্ষাৎ করতে মনস্থ করেন। দুইজন ইংরেজী শিক্ষিত যুবক তাঁর অনুবাদকের কাজ করতে সম্মত হয়। কিন্তু তারা কিছু আদায় করবার আশায় তাদের মূল্য বাড়াবার জন্য যথাকালে আত্মগোপন করে। মহাস্থবির কৃপাশরণ তাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে পূর্বোক্ত বন্ধুর সঙ্গে মিঃ বাটলারের ভবনাভিমুখে যাত্রা করেন। তিনি অনুভব করেন —যেখানে প্রাণ আছে, সেখানে ভাবপ্রকাশের উপায় হবেই। সাহেবের ভবনদ্বারে এসে প্রত্যাশী যুবকদ্বয় তাঁর সঙ্গ প্রার্থনা করে। তাদের নিশ্চয়তা উপলব্ধি করে তিনি বলেন—"ভাই, তোমাদের সাহায্য আমার দরকার হবে না।" এই বলে তিনি সাহসবিস্তৃত বক্ষে সাহেবের বাসভবনে প্রবেশ করেন। মিঃ বাটলার হঠাৎ আপনার সম্মুখে শান্ত সৌম্য সন্ন্যাসীদ্বয়কে দেখতে পেয়ে একটু স্তম্ভিত হন এবং জিজ্ঞাসা করেন—"আপনারা কি চান?" উত্তরে কৃপাশরণ হিন্দী ভাষায় বলেন—"এখানে কতকগুলি বৌদ্ধ পরিবারের বাস আছে এবং বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরাও মাঝে মাঝে আসেন। তাদের উপাসনার মন্দির ও বাসোপযোগী কোন ধর্মশালা নেই। যদি আপনি অনুগ্রহপূর্বক গভর্ণমেন্ট থেকে একখণ্ড জমি মঞ্জুর করে দেন, তা হলে তার উপর উপাসনাগার ও ধর্মশালা নির্মাণের চেষ্টা করব। আমি ভিক্ষাজীবী

সন্ন্যাসী, জমির উপযুক্ত মূল্য দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হবে না।" সাহেব বলেন — "এখানে তো বেশীসংখ্যক বৌদ্ধ নেই যে বৌদ্ধ উপাসনাগারের দরকার হবে এবং বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের বিশেষ যাতায়াত না থাকায় তাঁদের জন্য ধর্মশালার দরকার কি?" এর উত্তরে কৃপাশরণ বলেন—"সংখ্যায় অল্প বলে তাদের কি উপাসনার অধিকার নেই এবং মৃত্যুকালেও কি তারা গুরুর চরণ দর্শন করতে পারবে না?" কৃপাশরণের সরল ও নির্লিপ্ত ভাবভঙ্গী দেখে বিচক্ষণ বাটলার মুগ্ধ হন। তাঁরই সাহায্যে কৃপাশরণ লক্ষ্ণৌ শহরের কেন্দ্রস্থলে ১০ কাঠা পরিমাণ নিষ্কর জমি লাভ করেন। সেই থেকে মিঃ বাটলার তাঁর এক অকৃত্রিম বন্ধুতে পরিণত হন।

অতঃপর তিনি কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং লক্ষ্ণৌ শহরে প্রাপ্ত জমির উপর বিহার নির্মাণের জন্য অত্যন্ত উদ্যোগী হয়ে পড়েন। এই সময় তাঁর উপাধ্যায় মহাত্মা পূর্ণাচার উনাইনপুরা গ্রামে ভিক্ষুদের পরিবাস ব্রতে যোগদানের জন্য তাঁকে আমন্ত্রণ করেন। গুরুর আদেশ শিরোধার্য করে তিনি তথায় উপস্থিত হন এবং ব্রত সমাপনান্তর আকিয়াব যাত্রা করেন। তাঁর পূর্বেকার আকিয়ার ভ্রমণে শুধু প্রবাসী চট্টল বৌদ্ধগণেরই সহায়তা লাভ করেন। কিন্তু এইবার তিনি তাঁর কর্মক্ষেত্রের প্রতি আরাকানী বৌদ্ধগণেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হন। সেখানে তিনি তাঁর পরম সুহৃদ স্বনামখ্যাত আচার্য্য উ পুঞ্ঞ মহাস্থবিরের আতিথ্য গ্রহণ করেন। তাঁরই সভাপতিত্বে এক বিরাট জনসভায় আকিয়াবের নাগরিকগণ কর্তৃক কৃপাশরণ সংবর্দ্ধিত হন। সেই সংবর্ধনা সভায় তাঁরা ভারত ও ব্রহ্মের মধ্যে প্রীতির নিদর্শনস্বরূপ তাঁকে ২০০০ টাকা মূল্যের একটি অষ্টধাতু নির্মিত বুদ্ধমূর্তি দান করতে প্রতিশ্রুত হন। তার পর তিনি আকিয়াবে নানাস্থান ভ্রমণ করে চাঁদা সংগ্রহ কার্য শেষ করে কলকাতায় ফিরে আসেন।

কলকাতায় প্রত্যাবর্তনের পর তিনি তাঁর বন্ধু গুণালঙ্কারের সহায়তায় ব্রহ্মদেশ থেকে ত্রিপিটকসহ দুষ্প্রাপ্য বৌদ্ধশাস্ত্র গ্রন্থসমূহ এনে একটি বৌদ্ধ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর এই প্রচেষ্টা কলকাতার বিদ্বৎ সমাজের প্রশংসা অর্জন করে। সমগ্র ত্রিপিটক বঙ্গ ভাষায় অনুবাদ করে জনসমাজে প্রচার করার জন্য তাঁর ইচ্ছা হয়। কিন্তু এ অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য বলে আরব্ধ কার্য সমাপ্ত না করে এতে হস্তক্ষেপ করা সমীচীন মনে করেন নি। তবুও তিনি বুদ্ধের অমৃত বাণী প্রচার করবার উদ্দেশ্যে 'জগজ্জ্যোতি' নামক একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। বলা বাহুল্য, মহাস্থবির গুণালঙ্কার ও স্বামী পূর্ণানন্দের সম্পাদনায় এই পত্রিকাখানি বাঙলার সুধীসমাজে সমাদৃত হয় এবং বুদ্ধবাণী প্রচারে অদ্বিতীয় স্থান গ্রহণ করে।

কৃপাশরণ লক্ষ্ণৌ শহরে যে জমি প্রাপ্ত হন, তার কোন দানপত্র এ পর্যন্ত তিনি পান নি এবং তাঁর সহৃদয় বন্ধু মিঃ বাটলার বড়লাটের পররাষ্ট্র সচিবের পদে উন্নীত হয়ে তখন দিল্লীতে অবস্থান করেন। এ বিষয়ে লক্ষ্ণৌ-এর বর্তমান ডিঃ কমিশনার কোন ব্যবস্থা অবলম্বন

করেনি দেখে তিনি একটু চিন্তিত হন। এ বিষয়ে একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করবার জন্য তিনি দিল্লীতে গিয়ে মিঃ বাটলারের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁর সুপারিশ পত্র নিয়ে লক্ষ্ণৌ গমন করেন। সেই সুপারিশ পত্রের বলে তিনি জমি দখল নেন। সেই বৎসরেই অর্থাৎ ১৩১৫ সালের ১১ই মাঘ তিনি তাঁর শিষ্যমণ্ডলীর সহযোগিতায় সেই জমির উপর বিহারের ভিত্তি স্থাপন করেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই তার নির্মাণ কার্য শুরু করে দেন। এ সময় সঙ্ঘগুরু মহাত্মা পূর্ণাচার বৌদ্ধসমাজকে শোকসাগরে ভাসিয়ে নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করেন। তাঁর দেহত্যাগের সংবাদে কৃপাশরণ শোকাভিভূত হন এবং উপাধ্যায়ের শেষকৃত্য সম্পাদনের জন্য লক্ষ্ণৌ ত্যাগ করে চট্টগ্রামাভিমুখে রওনা হন। তথায় পৌঁছে উপাধ্যায়ের অন্তিম কৃত্য সশ্রদ্ধভাবে সমাপন করে লক্ষ্ণৌ বিহার নির্মাণের চাঁদার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম গমন করেন। তথায় চাকমা রাজার অনুরোধে একটি বৌদ্ধমন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন করে বুদ্ধমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন এবং নানা স্থানে চাঁদা সংগ্রহ করে কলকাতায় ফিরে আসেন।

অতঃপর আরকানবাসীদের প্রতিশ্রুত অষ্টধাতু নির্মিত বুদ্ধমূর্তি আকিয়াব হতে কলকাতায় নিয়ে আসেন। মহাসমারোহে মূর্তি প্রতিষ্ঠা উৎসব সম্পন্ন হয়। বলা বাহুল্য, তখন এরূপ সুবৃহৎ শিল্পশোভাময় বুদ্ধমূর্তি কলকাতাবাসীদের কাছে সম্পূর্ণ নতুন। ভগবান তথাগতের এই ধ্যানমূর্তি দর্শনের জন্য কয়েকদিন ধরে ধর্মাঙ্কুর বিহারে জাতিধর্মনির্বিশেষে লোক সমাগম হয়। বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না, কলকাতা মাদ্রাসার তদানীন্তন প্রিন্সিপাল ডক্টর রস বুদ্ধমূর্তি দর্শন করতে এসে কৃপাশরণের সঙ্গে পরিচয়ে মুগ্ধ হন। সেই থেকে উভয়ের মধ্যে সখ্যতা বন্ধন দৃঢ় হয়ে উঠে। ধর্মাঙ্কুর সভাও এই মহানুভব শ্বেতাঙ্গ শিক্ষাব্রতীকে অকৃত্রিম সেবক লাভ করে। এর অব্যবহিত পরে কৃপাশরণের গুণমুগ্ধ স্বরাষ্ট্র সচিব বাটলার কার্যোপলক্ষে সিমলা থেকে কলকাতায় আসেন। তিনি ব্রহ্মদেশ থেকে আনা বুদ্ধমূর্তি এবং কৃপাশরণের প্রতিষ্ঠান দেখবার অভিলাষ জ্ঞাপন করেন। কৃপাশরণের সাদর আহ্বানে তিনি ধর্মাঙ্কুরে এসে মূর্তি দর্শনে অত্যন্ত প্রীত হন। মনীষী হরিনাথ দে ও শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেই সময় উপস্থিত থেকে তাঁর অভ্যর্থনা করেন। তাঁর মুখে এই বৌদ্ধপ্রতিষ্ঠানের কথা শুনে তাঁরই সহকর্মী বেড্‌স এবং আর ডব্লিউ কারলাইল ধর্মাঙ্কুরে আগমন করেন। তাঁরা এর কার্যাবলী দেখে এবং কৃপাশরণের সঙ্গে আলাপ করে পরিতুষ্ট হন। বলা বাহুল্য, তাঁরাও ধর্মাঙ্কুরের পৃষ্ঠপোষকতা করেন।

যদিও কৃপাশরণ লক্ষ্ণৌর বাইরে থেকে অর্থ সংগ্রহে রত হন, লক্ষ্ণৌ বিহারের নির্মাণ কার্য উপযুক্ত কর্মী ভিক্ষু কালীকুমারের তত্ত্বাবধানে সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন হয়ে যায়। এই বৌদ্ধ বিহার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই সেই অঞ্চলে বৌদ্ধধর্মের সাড়া পড়ে। তা অচিরেই একটি বৃহৎ বৌদ্ধকেন্দ্রে পরিণত হয়। তথাকার সুধীবৃন্দ বিশেষ দিনে সমবেত হয়ে ভগবান বুদ্ধের জীবন ও বাণীর আলোচনায় জনতাকে অনুপ্রাণিত করেন। আধুনিক ভারতে বৌদ্ধ জাগরণের ইতিহাসে ধর্মাঙ্কুরের এই প্রতিষ্ঠানও একটি বিশেষ অবদান।

চার

বৌদ্ধপ্রধান দেশের ভাবধারার সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয়ের জন্য সিংহল (শ্রীলংকা) ও ব্রহ্মদেশ (মায়ানমার) দেখবার ইচ্ছা কৃপাশরণের নতুন নয়। কর্মোপলক্ষে ব্রহ্মদেশে কয়েকবার গিয়েও সময়ের অল্পতার জন্য তথাকার প্রসিদ্ধ স্থানসমূহ দর্শন এবং তথাকার জাতীয় জীবনের সঙ্গে পরিচয় তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। কর্ম বহুলতার জন্য বৌদ্ধদেশ দেখবার সুযোগ না পেলেও তিনি সেই আকাঙ্খা ত্যাগ করেন নি। অবশেষে ঘটনাক্রমে এই দু-টি দেশ ভ্রমণ করবার সুযোগ এসে পড়ে।

ব্রহ্মের অন্যতম সঙ্ঘনায়ক মৌলমেনের বৈজয়ন্ত সঙ্ঘারামের অধ্যক্ষ উ সাগর মহাস্থবির ভারতে বৌদ্ধধর্মের পুনরভ্যুত্থানের ক্ষেত্রে কৃপাশরণের সাধনা ও আত্মত্যাগের পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হন। তাঁরই সাদর আহ্বানে কৃপাশরণ ১৩১৬ সালে ব্রহ্মদেশাভিমুখে যাত্রা করেন। রেঙ্গুনে পৌঁছে তিনি বিপুলভাবে সংবর্দ্ধিত হন। অতঃপর তিনি ষ্টীমারযোগে মৌলমেন রওনা হন। পথে সেই ষ্টীমার সাইক্লোনের কবলে পড়ে অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত হয়। এই অভিজ্ঞতা তাঁর জীবনে সম্পূর্ণ নতুন। তখন যাত্রীদলের করুণ আর্তনাদে আকাশ বাতাস কেঁপে উঠে। সম্পদ বিপদে উদাসীন কৃপাশরণ অনুভব করেন—তাঁদের সলিল সমাধির বিলম্ব নেই। তিনি বিপদের শিয়রে বসে উপাসনায় রত হন। কয়েক ঘন্টা পরে জলপাতখানি বিপদমুক্ত হয়ে যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। এই পরিবর্তন লক্ষ্য করে তিনি ভাবাভিভূত হন।

ষ্টীমারখানি যখন মৌলমেন পৌঁছে, তখন ঘাটে তাঁর জন্য অপেক্ষমান জনতার ভিড় দুর্বার হয়ে উঠে। অনেকক্ষণ গাড়ী ঘোড়ার চলাচল বন্ধ থাকে। সেখান থেকে শোভাযাত্রা সহকারে তিনি বৈজয়ন্ত সঙ্ঘারামে নীত হন। পরদিন এক বিরাট জনসভায় তিনি অভিনন্দিত হন। তাঁর কার্যাবলীর প্রতি সদিচ্ছা জ্ঞাপনের জন্য উ সাগর মহাস্থবির ও উ তেজবন্ত মহাস্থবির ভগবান বুদ্ধের পরিনির্বাণ মূর্তি সহ বহু গ্রন্থরাজি তাঁকে উপহার দান করেন। কয়েকদিন ধরে তিনি মৌলমেনের বিভিন্ন বৌদ্ধবিহার পরিদর্শন করে আনন্দিত হন। রেঙ্গুনের চট্টল বৌদ্ধ সমিতি কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে তিনি সেই সমিতির প্রতিষ্ঠিত বিহারে পদার্পণ করেন। তাঁর দর্শনের জন্য তথায় বিপুল জনসমাবেশ হয়। ভক্তগণের প্রদত্ত দ্রব্যজাত উপহার তাঁর সম্মুখে স্তূপাকার হয়ে উঠে। তিনি অনুভব করেন—যদিও তিনি ভারতের একান্তে আপনার কর্মসাধনায় রত আছেন, তবুও তাঁর সাধনার দীপ্তি ভারতের সীমা অতিক্রম করেছে। তাঁর প্রতি জনতার এই স্বতঃস্ফূর্ত প্রীতি তারই নিদর্শন। এতে তিনি ভগবান বুদ্ধেরই মহিমা উপলব্ধি করেন। তিনি রেঙ্গুনে সোয়েডাগন পেগোডা প্রভৃতি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থানসমূহ দর্শন করে পরিতৃপ্ত হন। অতঃপর ব্রহ্মের বিভিন্ন নগর ও জনপদে অবস্থিত তীর্থস্থানগুলি দর্শনের জন্য বহির্গত হন এবং সর্বত্র সম্মানিত ও

সমাদৃত হয়ে দু-মাস কাল তীর্থভ্রমণে অতিবাহিত করেন। তথাকার জনগণের বদান্যতা, উদারতা, শ্রদ্ধাশীলতা প্রভৃতি সদ্‌গুণের পরিচয় পেয়ে তিনি ব্রহ্মদেশকে আদর্শ বৌদ্ধদেশ বলে অভিহিত করেন। এইভাবে তিনি তাঁর ব্রহ্মদেশ ভ্রমণ সমাপ্ত করে পরিপূর্ণ হৃদয়ে কলকাতায় ফিরে আসেন।

পরবর্তী বৎসরেই সুপ্রসিদ্ধ মহাবোধি সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা অনাগারিক ধর্মপাল কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে কৃপাশরণ ভক্ত সুগায়ক উপেন্দ্রলাল চৌধুরীকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীলঙ্কা যাত্রা করেন। তিনি মাদ্রাজ হয়ে তুতিকোরিন আসেন এবং সেখান থেকে ষ্টীমার যোগে ১৩১৭ সালের ফাল্গুন মাসে কলম্বো শহরে পৌঁছান। অনাগারিক ধর্মপাল, তাঁর অনুজ হেবাবিতারণ এবং হরিশচন্দ্র ব্রহ্মচারী প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক অভ্যর্থিত হয়ে শোভাযাত্রা সহ তিনি ধর্মপালের পিতৃভবনে নীত হন। সেদিন অপরাহ্নেই শ্রীলঙ্কার সঙ্ঘগুরু বিশ্ববিশ্রুত বৌদ্ধমনীষী সুমঙ্গল মহাস্থবিরের পৌরোহিত্য বিদ্যোদয় পরিবেণ-প্রাঙ্গণে বিরাট জনসভায় তিনি সংবর্দ্ধিত হন। বলা বাহুল্য, সেই পরিবেণেই তাঁর অবস্থানের সুবন্দোবস্ত হয়। ভারতে বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে সঙ্ঘগুরুর সাথে তাঁর বিশদ আলোচনা চলতে থাকে। এই আলোচনার ফলে সঙ্ঘগুরু বিদ্যোদয়ে ভারতীয় শিক্ষার্থীদের সর্বপ্রকার সুবিধা দান করতে প্রতিশ্রুত হন। কৃপাশরণ তাঁকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। বিদ্যোদয়ের অধ্যক্ষ খ্যাতনামা মহাস্থবির জ্ঞানীশ্বরের সঙ্গেও এই প্রসঙ্গে তাঁর অনেকক্ষণ আলোচনা হয়। তাঁদের সহৃদয়তায় ও অপূর্ব আতিথেয়তায় তিনি অত্যন্ত মুগ্ধ হন।

কয়েকদিন পরে তিনি কলম্বো থেকে ৬ মাইল দূরে কল্যাণী নদীর তীরে অবস্থিত কল্যাণী চৈত্য দর্শন করতে যান। এই সুপ্রাচীন চৈত্য অতীতের স্মৃতি বহন করে অক্ষুণ্ণ ভাবে দণ্ডায়মান। এর পাদদেশে স্বচ্ছসলিলা কল্যাণী কুলু কুলু করে বয়ে চলেছে। চতুর্দিকের আবেষ্টনী যেন এক অপরূপ মহিমায় সমাচ্ছন্ন। চৈত্যের সম্মুখে ভগবান বুদ্ধের উপাসনায় রত হয়ে তিনি পরম আনন্দ অনুভব করেন।

অতঃপর তিনি শ্রীলঙ্কার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সঙ্ঘারাম পেলিয়াগোডাস্থিত বিদ্যালঙ্কার পরিবেণে গমন করেন। তথাকার অধ্যক্ষ মহাপণ্ডিত ধর্মারাম মহাস্থবিরের সভাপতিত্বে সঙ্ঘসভায় তিনি সংবর্দ্ধিত হন। সভাভঙ্গের পর মহাস্থবির ধর্মারামের সহিত তাঁর বিবিধ আলোচনা চলে। মহাস্থবির ধর্মারাম প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ তাঁকে 'অট্‌ঠ পরিক্‌খার' বা ভিক্ষুর প্রয়োজনীয় আট রকমের দ্রব্য দান করেন। তিনি সশ্রদ্ধভাবে তা গ্রহণ করে তৃপ্ত হন।

কলম্বোয় প্রত্যাবর্তনের পর গল নগরের তদানীন্তন বিখ্যাত ধনী এম এল নালিস কর্তৃক নিমন্ত্রিত হয়ে তিনি গল নগরাভিমুখে যাত্রা করেন। কলম্বো থেকে গল পর্যন্ত রেলপথ বরাবর সমুদ্রের তটভূমির উপর দিয়ে গেছে। পথের একধারে দিগন্তব্যাপী

সারি সারি নারিকেল বন এবং অন্যধারে সমুদ্র উন্মত্ত গর্জনে বালুকাময় বেলাভূমির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। এই অপরূপ দৃশ্য দেখে তিনি ভাবোন্মত্ত হন। আসন্ন সন্ধ্যায় পরিপূর্ণ হৃদয়ে তিনি যখন গল ষ্টেশনে পৌঁছান, তখন মিঃ নালিস প্রমুখ তথাকার জনতা কর্তৃক বিপুলভাবে অভ্যর্থিত হন। তিনি তথায় সপ্তাহকাল অবস্থান করে সেখানকার বিভিন্ন সঙ্ঘারাম পরিদর্শন করেন এবং বিশিষ্ট শ্রমণবৃন্দের সঙ্গে আলাপে মুগ্ধ হন।

গল থেকে কলম্বোয় ফিরে পরের দিনই তিনি শ্রীলঙ্কার প্রাচীন রাজধানী অনুরাধাপুর গমন করেন। এর অসংখ্য ধ্বংসাবশেষ সিংহলের গৌরবময় অতীতের সাক্ষ্য বহন করে যেন আপনার মৌন ভাষায় বলে—"তিষ্ঠ ক্ষণেক পথিক প্রবর"। অতীতের স্মৃতি বিজড়িত এই প্রাচীন রাজধানীতে এসে কৃপাশরণ যেন আপনাকে হারিয়ে ফেলেন। যতদূর দৃষ্টি যায়, ততদূর শুধু বিহার মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ, কোথাও ফাঁক নেই; অপরূপ কারুকার্যখচিত পাষাণ ফলক ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রয়েছে। দূর অতীতে এখানেই মহাবিহার নামে অভিহিত বিশ্ববিদ্যালয় শতাব্দীর পর শতাব্দী প্রাচ্যের অন্যতম সাংস্কৃতিক কেন্দ্ররূপে বিরাজ করে। আচার্য বুদ্ধঘোষ, আচার্য বুদ্ধদত্ত প্রভৃতি দিগ্বিজয়ী বৌদ্ধ মনীষীরা এর অধ্যক্ষের পদ অলঙ্কৃত করেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তরময় বিস্তীর্ণ ধ্বংসাবশেষ দেখে মহাস্থবির কৃপাশরণ স্তম্ভিত হন এবং ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে বিস্ময়বিমুগ্ধ নয়নে সমস্ত পরিদর্শন করেন। অতঃপর তিনি এর অনতিদূরে অবস্থিত 'রুবনমালী' মহাস্তূপ প্রাঙ্গণে উপনীত হন। সিংহলকেশরী গামনী প্রতিষ্ঠিত এই পর্বতায়মান স্তূপ শোভায় সৌন্দর্যে দর্শকের হৃদয়হরণ করে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি ভাবাবেগে স্তূপমূলে লুটিয়ে পড়েন এবং ভগবান বুদ্ধের উপাসনায় রত হন। পরদিন তিনি অশোকনন্দিনী সঙ্ঘমিত্রা প্রোথিত বোধিশাখাতরু দর্শন করতে যান। এই সুপ্রাচীন তরু সম্রাট অশোকের ধর্মবিজয়ের স্মারকরূপে যুগযুগান্তর ধরে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি বোধিতরুর পূজা সমাপ্ত করে ইসুরুমুনি বিহার প্রভৃতি দর্শনীয় স্থানসমূহ দর্শন করেন। এরূপে কয়েকদিন ধরে অনুরাধাপুরে উন্নত শিল্প ও ভাস্কর্যের পরিচায়ক অতীত কীর্তিসমূহ দর্শন করে তিনি মুগ্ধ হন।

অতঃপর তিনি অনুরাধাপুরের অনতিদূরে মিহিন্‌তল পর্বত দেখতে যান। এখানেই ভিক্ষু মহেন্দ্র সিংহলরাজ দেবপ্রিয় তিষ্যকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করে সিংহলে বৌদ্ধধর্মের ভিত্তি স্থাপন করেন। অতীতের পুণ্য স্মৃতি জড়িত এই তীর্থ দর্শন করে কৃপাশরণ আপনাকে কৃতার্থ মনে করেন।

অনুরাধাপুর পরিভ্রমণ সমাপ্ত করে তিনি পরিপূর্ণ হৃদয়ে কাণ্ডি নগরাভিমুখে যাত্রা করেন। তিনি সেখানে বিরাট জনতা কর্তৃক সংবর্দ্ধিত হন। শৈলমালা পরিবেষ্টিত জলাশয়-শোভিত সৌধশ্রেণীপূর্ণ এই নগরের নৈসর্গিক দৃশ্য দেখে তিনি মুগ্ধ হন এবং একে

সৌন্দর্যের লীলানিকেতন বলে বর্ণনা করেন। এখানকার বিভিন্ন সঙ্ঘারাম ও দর্শনীয় স্থানসমূহ দর্শন করে তিনি এক সন্ধ্যায় দন্ত মন্দিরে উপস্থিত হন। আরতির কাঁসর ঘন্টা, মুখরিত দীপ ধুনায় সমাচ্ছন্ন মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করেই তিনি অনুভব করেন তিনি যেন শুভ মুহূর্তে এই মহাপুণ্যস্থানে এসে পড়েছেন। এর নিগূঢ় মহিমা উপলব্ধি করে তিনি স্বতঃই সেখানে উপাসনায় রত হন। উপাসনা সমাপ্তির পর স্তব্ধভাবে কিছুক্ষণ অতিবাহিত করে তিনি মন্দির প্রাঙ্গণ ত্যাগ করেন।

পরের দিন তিনি কলম্বোয় ফিরে আসেন। মোটের উপর তিনি সিংহলে নানাস্থান পরিভ্রমণ করে দেড়মাস কাল অতিবাহিত করেন। বলা বাহুল্য তাঁর এই ভ্রমণ শ্রদ্ধায় ভাবে প্রেমে প্রীতিতে পরিপূর্ণ এবং মধুর। ভারত ও ভারতবাসীর প্রতি তথাকার জনসাধারণের অকৃত্রিম প্রীতি তাঁকে অত্যন্ত মুগ্ধ করে। তাদের সদ্ধর্ম নিষ্ঠা উদারতা প্রভৃতি গুণ তিনি মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার না করে পারেন নি। সেখানকার সঙ্ঘারামগুলি জাতীয় সংস্কৃতির ধারক বাহক জেনে চট্টগ্রামের বৌদ্ধবিহারসমূহে অনুরূপ আবহাওয়া সৃষ্টির জন্য তিনি অনুপ্রেরণা লাভ করেন। অবশেষে তিনি সিংহলের উজ্জ্বল স্মৃতি মনে চিরতরে অঙ্কিত করে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বন্ধুবর্গের নিকট বিদায় গ্রহণ করে কলম্বো ত্যাগ করেন।

পাঁচ

ধর্মাঙ্কুর বিহার নির্মিত হবার পূর্বে নানা দেশাগত বৌদ্ধ তীর্থযাত্রীদের কলকাতায় যাত্রীনিবাসের অভাবে ভয়ানক অসুবিধা ভোগ করতে হত। ধর্মাঙ্কুর নির্মিত হবার পর এই অসুবিধা দূরীভূত হয়। বলা বাহুল্য, সেকালে যাত্রীসংখ্যা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল বলে স্থানাভাব হত না। বৎসরের পর বৎসর যখন যাত্রীসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে, তখন ধর্মাঙ্কুরে যাত্রীদের স্থান সঙ্কুলান হয় না এবং কোন যাত্রী রোগাক্রান্ত হলে রোগীর জন্য স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত না থাকায় বিশেষ অসুবিধা ঘটে। এই ব্যাপারে মহাস্থবির কৃপাশরণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। তিনি এই সমস্যার সমাধানের জন্য ধর্মাঙ্কুর বিহারকে দ্বিতলে পরিণত করতে ও বারান্দার একধারে রোগীর জন্য একটি ঘর নির্মাণ করতে মনস্থ করেন। তাঁর ভাণ্ডার তখন অর্থশূন্য। অথচ কার্যটি অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ। তাঁর একমাত্র অবলম্বন ভিক্ষাপাত্রের কথা তাঁর মনে পড়ে।

তিনি ভিক্ষাপাত্র সম্বল করে চট্টগ্রামের গ্রাম গ্রামান্তর ভ্রমণে বের হন। কিন্তু এবারে ভিক্ষায় গিয়ে তিনি একটি পরিবর্তন লক্ষ করেন। পূর্বে চাঁদা সংগ্রহ যেমন একটি দুঃসাধ্য কর্ম ছিল, তা এখন আর সেরূপ জটিলতাপূর্ণ নয়। তিনি যে গ্রামে উপস্থিত হন, সেই গ্রাম তাঁর আগমনে সজীব হয়ে উঠে। প্রত্যেক গ্রামে আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা তাঁকে অভ্যর্থিত করে এবং তাঁর ভিক্ষাপাত্রে দান করে কৃতার্থ হয়। তিনি আপনার সরল ভাষায় ধর্মের সারমর্ম ব্যাখ্যা করে জনতাকে আপ্যায়িত করেন। এভাবে তিনি চট্টগ্রামের বৌদ্ধ জনতার সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয়ে তাদের প্রাণের কথা উপলব্ধি করেন। তারা তাঁর মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়। বহু গ্রাম পরিভ্রমণের পর তিনি তাঁর জন্মস্থানে উপস্থিত হন। এই সময় অনাগারিক ধর্মপাল চট্টলবাসী বৌদ্ধদের সাদর আমন্ত্রণে চট্টগ্রামে আগমন করেন। তাঁর সমুচিত সংবর্দ্ধনার জন্য কৃপাশরণ তাঁর শিষ্যবর্গ সহ চট্টগ্রাম শহরে উপস্থিত হন। সেখানে তাঁর পৌরোহিত্যে বৌদ্ধগণ অনাগারিককে বিপুলভাবে সংবর্দ্ধিত করেন।

অতঃপর অনাগারিক ধর্মপাল শোভাযাত্রা সহকারে বিভিন্ন বৌদ্ধগ্রামে নীত হন। মহাস্থবির কৃপাশরণও তাঁর সঙ্গে থাকেন। এই উভয় কর্মযোগীর অভ্যাগমনে সর্বত্র সাড়া পড়ে। জনতার স্বতস্ফূর্ত ভাব ভক্তিতে অনাগারিক অত্যন্ত অভিভূত হন। তাঁর আদর্শ ত্যাগ ও কর্মনিষ্ঠার প্রতি জনতার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা অনুভব করে তিনি বক্তৃতা প্রসঙ্গে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। বলা বাহুল্য, তাঁর এই চট্টল ভ্রমণে বাঙালী ও সিংহলের বৌদ্ধগণের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববন্ধন দৃঢ় হয়ে উঠে।

অনাগারিকের চট্টগ্রাম ত্যাগের পর মহাস্থবির আরও কিছুকাল গ্রাম গ্রামান্তর ভ্রমণ করে চাঁদা সংগ্রহ করতে থাকেন। অনবরত ভ্রমণে মহাস্থবিরের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে। তখন তিনি সংকল্পপূরণে পশ্চাদ্‌পদ না হয়ে চাঁদা সংগ্রহের জন্য ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে আসাম যাত্রা

করেন। আসামবাসী ও আসামপ্রবাসী বৌদ্ধগণ তাঁর আকস্মিক আগমনে অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং তাঁর যথোচিত অভ্যর্থনা করেন। তিনি জনতাকে ধর্মোপদেশ দান করে বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করেন এবং তাঁর শুভকার্যের সাহায্য স্বরূপ অনেক টাকা প্রাপ্ত হন। তাঁর অত্যধিক ভ্রমণজনিত শ্রম, অনিয়মিত আহার ও অনিদ্রায় স্বাস্থ্যের অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হতে থাকে এবং হঠাৎ তিনি ভীষণভাবে জরাক্রান্ত হন। তাঁর শিষ্যবর্গ যথাশীঘ্র তাঁর চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত করেন এবং যথোচিত সেবা শুশ্রূষায় রত হন। চিকিৎসা সত্ত্বেও তাঁর রোগ বৃদ্ধি পেতে থাকে। কিন্তু রোগের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে তিনি তাঁর আরব্ধ কার্যের কথাই বার বার বলতে থাকেন। তার অসমাপ্তি তাঁর মনকে ব্যথিত করে। এ বিষয়ে তিনি শিষ্যদিগকে নির্দেশ দেন। দৈনন্দিন রোগের অবস্থা গুরুতর হতে থাকায় তাঁর শিষ্যবর্গ অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েন। তথাগতের কৃপায় হঠাৎ তাঁর রোগের অবস্থা উপশমের দিকে পরিবর্তিত হয়। দেখতে দেখতে তিনি সুস্থ হয়ে উঠেন। এতে তাঁর শিষ্যগণের আনন্দের সীমা থাকে না। বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না, চিকিৎসক মহাস্থবিরের পূর্ব পরিচিত নয়। অথচ তাঁকে দর্শনী ও ঔষধপত্রের জন্য টাকা দেওয়া হলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করে বলেন—"এই মহাপুরুষের চিকিৎসার সুযোগ লাভ করে আমি কৃতার্থ। তাঁর আশীর্বাদই আমার শ্রেষ্ঠ পারিতোষিক, অতএব এই টাকা তাঁর পথ্যের জন্যই ব্যয় করুন।" অতঃপর প্রতিদিনই এই উদারপ্রাণ চিকিৎসক তাঁকে দেখতে আসেন এবং কিছুদিন বিশ্রামের জন্য পরামর্শ দেন। কিন্তু কর্মস্থলের কথা ভেবে মহাস্থবির চিকিৎসকের নিষেধ মানতে পারেন নি এবং দুর্বল শরীরে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন।

কলকাতা পৌঁছবার পরদিনই আবার তাঁর প্রবল জ্বর আসে। কালবিলম্ব না করে সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক ডাঃ সতীশচন্দ্র সেনগুপ্ত এম ডি মহাশয়কে আনা হয়। দিনের পর দিন রোগ বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও ডাঃ সেনগুপ্তের চিকিৎসা নৈপুণ্যে দু-সপ্তাহকাল পরে তাঁর জ্বর বন্ধ হয়। এই অবস্থায় তিনি লাঠি ভর করে আপনার পরিকল্পিত কার্য আরম্ভ করে দেন। রোগশীর্ণ শরীরে কাজের চাপ সহ্য করতে না পেরে ৪/৫ দিন পরেই আবার জ্বর আসে। পরদিন অপরাহ্নে জ্বরের প্রকোপে তাঁর চৈতন্য লোপ হয়। ডক্টর সেনগুপ্ত ডক্টর ব্রাউনকে নিয়ে এসে রোগ পরীক্ষা করতে পরামর্শ দেন। এই পরামর্শ অনুসারে ব্রাউন সাহেবকে আনা হয়। তিনি মহাস্থবিরকে পরীক্ষা করে আশ্চার্যান্বিত হয়ে মন্তব্য করেন—"এই রকম শরীর কখনও আমার নজরে পড়েনি। অস্থিচর্মাবৃত কঙ্কালসার দেহ কি করে এমন কর্মঠ ও ক্রিয়াশীল হয়, তা বিস্ময়ের বিষয়।" রোগ পরীক্ষার পর ব্রাউন সাহেবকে দর্শনী দেয়া হলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করে বলেন—"এঁর চিকিৎসার বাবদ আমি কিছুই নিতে পারব না; দরকার হলে এর চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন করতে আমি কুণ্ঠিত হব না।" একজন বিদেশী ব্যক্তি দর্শনমাত্রেই এই ভারতীয় বৌদ্ধভিক্ষুর প্রতি এভাবে মুগ্ধ হতে পারেন, এ আমাদের ধারণার অতীত।

পূর্বোক্ত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণের সুচিকিৎসায় তিনি অচিরেই আরোগ্য লাভ করেন। বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না—ডক্টর সেনগুপ্ত সুদীর্ঘকাল তাঁর চিকিৎসা করা সত্ত্বেও পারিশ্রমিক স্বরূপ এক কর্পদকও গ্রহণ করেন নি। ইহা সেনগুপ্ত মহাশয়ের মহানুভবতারই পরিচায়ক। আরোগ্যলাভের অব্যবহিত পরে মহাস্থবির আবার নিজের কার্যভার গ্রহণ করেন। ধর্মাঙ্কুরের দ্বিতল নির্মাণের কার্য দ্রুত চলতে থাকে। এই কার্যে ৬০০০টাকা ব্যয় করবার পর টাকার অভাবে তিনি নির্মাণ কার্য স্থগিত রাখতে বাধ্য হন। এই সময় একটি মর্মন্তুদ ঘটনা ঘটে। আসাম ও সিকিম প্রভৃতি দেশের বিভিন্ন স্থানে বৌদ্ধধর্ম প্রচাররত তাঁর সুযোগ্য শিষ্য ভিক্ষু কালীকুমার হঠাৎ দেহত্যাগ করেন। এই ধর্মপ্রাণ কর্মব্রতী ভিক্ষুর অকাল প্রয়াণের সংবাদ যখন মহাস্থবিরের কানে আসে, তখন তিনি দুঃসহ শোকে অভিভূত হয়ে বালকের মত রোদন করতে থাকেন। বলা বাহুল্য, এই শোক সামলাতে তাঁর মত রিক্ত সন্ন্যাসীরও বেশ বেগ পেতে হয়।

অতঃপর তিনি ধর্মাঙ্কুরের অর্দ্ধনির্মিত দ্বিতলের কার্য শেষ করবার জন্য দৃঢ়সংকল্প হন। এজন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সমস্যা সমাধানে তিনি শীর্ণ দেহে দেশ ভ্রমণে বের হয়ে নানা স্থান ভ্রমণ করেন এবং যথাসাধ্য অর্থ সংগ্রহ করে কলকাতায় ফিরে আসেন। কয়েক দিন বিশ্রামের পর তিনি দ্বিতলের অর্দ্ধসমাপ্ত কার্য আরম্ভ করে দেন। দেখতে দেখতে ধর্মাঙ্কুর দ্বিতল ভবনে পরিণত হয়। বলা বাহুল্য এর পর তীর্থযাত্রীগণের স্থানাভাবের অসুবিধা দূরীভূত হয়। জনসাধারণের এই অভাব পূর্ণ করতে পেরে তিনি তৃপ্তি অনুভব করেন।

বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না, ধর্মাঙ্কুরের দ্বিতল নির্মাণের সময় অর্থাৎ ১৩২১ সালের আষাঢ় মাস থেকে ১৩২২ সালের পৌষমাস পর্যন্ত এই সময়টি তাঁর জীবনে ঘোর সঙ্কটময়। একদিকে উপর্য্যুপরি মারাত্মক ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে তাঁর জীবন সংশয় উপস্থিত হয়, অপরদিকে তাঁর বিরুদ্ধে কুলোকের ষড়যন্ত্র, নিন্দাবাদ এবং শিষ্য-বিয়োগ ইত্যাদি নানারকম বিপত্তি এসে পড়ে। এই সমস্ত ঝড়-ঝঞ্ঝা অতিক্রম করে কিভাবে তিনি আপনার কর্তব্যপথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হন তা ভাবলেও বিস্মিত হতে হয়। সম্মুখে বিপদের পর বিপদ দেখে তিনি বিচলিত হন নি এবং তার মধ্যে তিনি শক্তির উৎস খুঁজে পান। এই নিগূঢ় শক্তির প্রভাবেই তিনি সমস্ত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে আপনার কর্মক্ষেত্রকে আবার উজ্জ্বল করে তোলেন এবং আপনার কর্মধারা নানাদিকে প্রসারিত করেন।

ছয়

মহাস্থবির কৃপাশরণের জীবদ্দশাতেই তাঁর অনুরাগী ভক্তগণ তাঁর প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও প্রীতির নির্দশন স্বরূপ ধর্মাঙ্কুর প্রাঙ্গণে তাঁর মর্মর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করতে কৃতসংকল্প হন। এই বিষয়ে তাঁরা অনেক দূর অগ্রসর হয়ে মহাস্থবিরের অনুমতি প্রার্থনা করেন। তাঁদের ঐকান্তিক আগ্রহ দেখে তিনি এতে মৌন সম্মতি দানে বাধ্য হন। অতঃপর ভক্তগণ বহু অর্থব্যয়ে ইতালী হতে ইতালীয় ভাস্কর নির্মিত তাঁর মর্মর প্রতিকৃতি আনয়ন করেন। তাঁর লক্ষ্ণৌ-এ অবস্থানকালে মূর্তি উন্মোচনের দিন নির্দ্ধারিত হয়। এই উপলক্ষে ধর্মাঙ্কুরে (৩১ শে অক্টোবর ১৯১৫) বিরাট সভা অনুষ্ঠিত হয়। স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এ সভায় পৌরোহিত্য করেন।

উদ্বোধন সঙ্গীতের পর ধর্মাঙ্কুর সভার তদানীন্তন সহসম্পাদক গজেন্দ্রলাল চৌধুরী মহাস্থবিরের জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনাগুলি উল্লেখ করে তাঁর জীবনী পাঠ করেন। সভাপতি মহোদয় তাঁর অভিভাষণে বলেন—

"মহাস্থবির আমার বন্ধু। তাঁর প্রতিষ্ঠিত এই ধর্মাঙ্কুর সভা আজ জনসাধারণের পরিচিত। আপনারা প্রশংসা করছেন যে আমি বৌদ্ধ সাহিত্য প্রচারে সাহায্য করেছি। এর মূলে শুধু মহাস্থবির মহোদয়ের সঙ্গে আমার পরিচয়। তাঁর সঙ্গে পরিচয়েই বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি ও বৌদ্ধ সাহিত্যের প্রতি আমার মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। সম্পাদক মহাশয় এখন মহাস্থবির মহোদয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনীতে তাঁর জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনার উল্লেখ করেছেন। তিনি ঘটনাগুলি অতি সুচারুরূপে বর্ণনা করেছেন। মহাস্থবির যে সকলের ভক্তির পাত্র, পূজার পাত্র এতে কোন সন্দেহ নেই।" এই অভিভাষণের পর প্রধান অতিথি অনাগারিক ধর্মপাল ইংরেজী ভাষায় বলেন—"আমরা সকলে আজ এখানে মহাস্থবিরের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য সমবেত হয়েছি। তিনি ২৯ বৎসর পূর্বে পূর্ববঙ্গ থেকে এই কলকাতায় আগমন করেছেন এবং আমি সিংহলে থেকে এখানে আগমন করেছি অর্থাৎ তিনি পূর্বদিক হতে, আমি দক্ষিণদিক হতে একই উদ্দেশ্য কর্মক্ষেত্র অবতীর্ণ হয়েছি। অতএব আমাদের লক্ষ্য অভিন্ন। আজ এই অনুষ্ঠানে আমি সিংহলবাসী বৌদ্ধগণের পক্ষ হতে তাঁকে সম্মানের অর্ঘ্য অর্পণ করছি।"

কলকাতা সংস্কৃত কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় ডঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ বলেন—"আমরা আজ যে মহাত্মার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য উপস্থিত হয়েছি তিনি যে শুধু কলকাতায় বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেছেন এমন নয়। দার্জিলিং, সিমলা, আসাম প্রভৃতি স্থানেও শত শত শত লোক তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছে। আমার মনে হয়, প্রাচীন কাল হতে এই বৌদ্ধধর্ম ভিক্ষুদের দ্বারা প্রচারিত হয়েছিল। জাপান, চীন প্রভৃতি দেশের ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, নালন্দা প্রভৃতি স্থান হতে ভিক্ষুগণ দলে দলে দুর্গম গিরি

গহ্বর, উত্তুঙ্গ পর্বত অতিক্রম করে দেশে দেশে ধর্ম প্রচার করতেন। সম্পাদক মহাশয় মহাস্থবিরের জীবনী বর্ণনা করেছেন। মহাস্থবির যে সম্মানের পাত্র, পূজার পাত্র, এতে কোনো সন্দেহ নেই।"

তাঁর বক্তৃতার পর সভাপতি প্রমুখ সভ্যবৃন্দ মূর্তিমণ্ডপে অগ্রসর হন। সভাপতি মহোদয় শঙ্খ ঘন্টা ধ্বনির মধ্যে মহাস্থবির কৃপাশরণের মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন। তখন জনতার জয়ধ্বনিতে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত হয়।

সভাপতি ও সভ্যবৃন্দ সভামণ্ডপে পুনঃ যথাস্থানে আসন গ্রহণ করলে চুনীলাল বসু বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন—"এই কলকাতা শহরে যে বৌদ্ধধর্মের সূচনা হয়েছে, এর ফলাফল ভবিতব্যই জানে। বৌদ্ধধর্ম ভারতের গৌরবের ধন। পৃথিবীর যত ধর্ম সংস্থাপিত হয়েছে সমস্তই এশিয়া খণ্ডে। বৌদ্ধধর্ম আমাদেরই ধর্ম। বৌদ্ধধর্মের একটি উপদেশ আছে—অহিংসা পরমো ধম্মো; ইহা অতি উত্তম উপদেশ। কৃপাশরণ এই মন্ত্রেরই উপাসক। তা আমরা তাঁর জীবনে প্রতিফলিত দেখছি। সম্পাদক মহাশয়ের মুখে কৃপাশরণ মহাস্থবিরের জীবনীর যে অংশটুকু আমরা এইমাত্র শুনলাম, তাঁর কার্যপদ্ধতি তারই জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ।" মহাস্থবিরের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করে চারুচন্দ্র বসু বলেন—"কৃপাশরণকে যে আমরা শ্রদ্ধা করি, তা তাঁর ধনের জন্য নয়, মানের জন্য নয়, তাঁর বিদ্যার জন্য নয়, তিনি আমাদের আদরের পাত্র, সম্মানের পাত্র।"

টাঁকির জমিদার যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী বলেন—"আমার বলবার কিছু নেই, তবে মহাপুরুষের মূর্তি প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে এসে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করা আমি সমীচীন মনে করি না। আমি মহাস্থবির কৃপাশরণের জীবনে প্রাচীন কালের ভিক্ষুগণের ছায়া দেখতে পাই। প্রত্যেক ধর্মই অন্যান্য উপধর্মের সঙ্গে মিলিত হয়ে আপনার মৌলিকত্ব হারায়। যাঁরা এই আবিলতা দূর করেছেন, কৃপাশরণ তাঁদের অন্যতম। প্রকৃত ধার্মিক ব্যক্তি যে ধর্মে থাকুন না কেন, তিনি লোকমাত্রেরই নমস্য। প্রকৃত ধর্ম প্রকৃত মিলনক্ষেত্র। কৃপাশরণ অনাবিল বৌদ্ধধর্মের বিজয়কেতন উড্ডীন করেছেন। অতএব তিনি সকলেরই ভক্তির পাত্র।"

প্রবীণ সাহিত্যিক তিনকড়ি মুখোপাধ্যায় বলেন—"২০ বৎসর পূর্ব হতেই মহাস্থবির মহাশয়কে আমি জানি। বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভার পরামর্শের জন্য তিনি যখন নরেন্দ্রনাথ সেন মহোদয়ের নিকট যেতেন, তখন তাঁর কথাবার্তা ও ভাবগতিক দেখে তাঁর সহিত পরিচিত হবার ইচ্ছা জাগে। সেই থেকেই তিনি আমার বন্ধু হন এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত ধর্মাঙ্কুর সভার সহিত আমার ঘনিষ্ট পরিচয় হয়। তিনি এই স্থান সমুজ্জ্বল করেছেন। তাঁর প্রতি ভক্তি প্রদর্শন আমাদের কর্তব্য।

অতঃপর কলকাতা হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ আইনজীবী বাগ্মীবর শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বলেন—"প্রকৃতির লীলাভূমি চট্টগ্রাম হতে এসে মহাস্থবির কৃপাশরণ এই কলকাতা

মহানগরীতে বৌদ্ধধর্মের জয় ঘোষণা করছেন। তাঁর ধন নেই, বিদ্যা নেই, শক্তি নেই—আছে শুধু কর্মের সাধনা। এই সাধনার বলে তিনি সর্বত্র পূজিত সম্মানিত। মানুষের মধ্যে একটা কামনা অন্তর্নিহিত আছে; সেইটি মানুষের অমরত্ব লাভের ইচ্ছা। যিনি পৃথিবীতে কীর্তি রেখে যান, তিনিই অমরত্ব লাভ করেন—কীর্তি যস্য সঃ জীবতি। আজ আমরা কৃপাশরণের পূজার আয়োজন করেছি। ইহা তাঁর ত্যাগের পূজা, মহত্বের পূজা। একটি প্রবাদ বাক্য প্রচলিত আছে যিনি আপনার স্মৃতি দেখে যান, তিনি শতবর্ষ আয়ু লাভ করেন। কৃপাশরণ তোমার জন্ম সার্থক। তুমি ক্ষণজন্মা! তুমি মহাপুরুষ!" অবশেষে রেবতীরমণ বড়ুয়া এম এ, বি এল ধর্মাঙ্কুর সভার পক্ষ হতে সভাপতি, প্রধান অতিথি ও বক্তাগণকে ধন্যবাদ প্রদান করেন।

উক্ত অনুষ্ঠানের পর হতে অনেক ভক্ত এসে মহাস্থবিরের মর্মর মূর্তি দর্শন করেন। যাঁরা এখনও তাঁর প্রধান কর্মক্ষেত্র ধর্মাঙ্কুরে আগমন করেন, তাঁরা একবার স্তব্ধ হয়ে এই মূর্তির সম্মুখে দাঁড়ান, এর নীচে ক্ষোদিত প্রস্তরলিপির প্রতিধ্বনি তুলে যেন মনে মনে বলেন—

সত্য বটে নহ তুমি রাজা মহারাজ,
নহ তুমি লক্ষপতি অথবা পণ্ডিত,
তবুও তোমার অই মহত্বের কাছে
রাজ চক্রবর্তী কিংবা মনীষী গৌরব
হয় খর্ব প্রতিদিন হে ভিক্ষু প্রবর!
লয়ে ভিক্ষাপাত্র করে, অঙ্গে চীরবাস
দেশ দেশান্তর তুমি করি পর্যটন
তিল তিল উপাদান করি আহরণ
স্থাপিলে অক্ষয় কীর্তি পিরামিড সম
এ মহানগর মাঝে যুগ যুগান্তর
ঘোষিতে ত্রিরত্ন জয়!
আড়ম্বরহীন
সারল্যের প্রতিমূর্তি তুমি ধর্মপ্রাণ
একেই বলে দেব! প্রকৃত নির্বাণ।

সাত

১৩২৪ সালে বাঙ্গালা দেশের নানা জেলায় এবং ভুটান রাজ্যের অন্তর্গত নানাস্থানে পরিভ্রমণ করে মহাস্থবির কৃপাশরণ ধর্মপ্রচার করতে থাকেন। এর অব্যবহিত পরে তিনি শিলং পাহাড়ে গমন করেন এবং সেখান থেকে আসামের নানাস্থানে ধর্ম প্রচার করতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন। অসুস্থতার জন্য তিনি শিলং-এ প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য হন। সেখানকার স্বাস্থ্যকর আবহাওয়ায় সুচিকিৎসার ফলে তিনি অচিরেই আরোগ্য লাভ করেন। এর পর তিনি আবার আপনার কার্যভার গ্রহণ করেন। বলা বাহুল্য, সেখানকার নানা সম্প্রদায়ের লোকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁর প্রতি মুগ্ধ হন। তাঁদের সহায়তায় তিনি শিলং-এ বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভার শাখা স্থাপন করেন। সভার প্রথম অধিবেশনে বিপুল জনসমাগম হয়। তিনি জনতার আগ্রহ দেখে শিলং শহরে বৌদ্ধবিহার নির্মাণের সংকল্প করেন।

অতঃপর তিনি কলকাতায় ফিরে চাঁদা সংগ্রহের জন্য আবার চট্টগ্রাম যাত্রা করেন। সেখানে গ্রাম গ্রামান্তর পরিভ্রমণের পর রোগাক্রান্ত হয়ে চট্টগ্রাম শহরে জনৈক ভক্তের বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ক্রমে তাঁর রোগ প্রবল হতে প্রবলতর হয়ে উঠে। ভক্তগণের উৎকণ্ঠার সীমা থাকে না। তাঁদের অকৃত্রিম যত্নে এবং বিশিষ্ট চিকিৎসকগণের চিকিৎসায় তিনি ধীরে ধীরে আরোগ্যলাভ করেন। দীর্ঘদিনের রোগযন্ত্রণায় তাঁর স্বাস্থ্য একান্ত দুর্বল হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় তিনি কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁর স্বাস্থ্যের শোচনীয় অবনতি দেখে সকলেই চিন্তিত হয়ে পড়েন এবং দীর্ঘদিন বিশ্রাম গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু যিনি কর্মসাধনার জন্য পৃথিবীতে এসেছেন এবং কর্মই যাঁর মনের আনন্দ, প্রাণের আরাম, তিনি কি কর্মহীন জীবন যাপন করতে পারেন? তিনি ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়ে দার্জিলিং অভিমুখে রওনা হন। ইতিপূর্বে তিনি সেখানে বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভার শাখা স্থাপন করেন। বৌদ্ধধর্মের প্রতি সেখানকার সুধীবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

এই সময় তাঁর ভক্তগণ দার্জিলিং-এ তাঁর চতুর্পঞ্চাশতম জন্মবার্ষিকীর অনুষ্ঠান করেন। স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এ অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন। এই অনুষ্ঠানে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি সমবেত হন। মহাস্থবিরের গুণমুগ্ধ বর্ধমানাধিপতি বিজয়চাঁদ মহতাব তাঁদের অন্যতম। স্যর আশুতোষ দার্জিলিং-এ বৌদ্ধবিহার নির্মাণের জন্য বর্ধমানাধিপতিকে একখণ্ড জমি দান করতে অনুরোধ করেন। মহারাজা আপনার উদারতার পরিচয় প্রদান করে বলেন— "মহাস্থবির মহোদয় যে স্থান নিজে নির্বাচন করবেন, সেই স্থানে ৩ বিঘা ৫ কাঠা পরিমাণ জমি বৌদ্ধবিহারের জন্য আমি দান করব।" মহারাজার এই মহানুভবতা উপলব্ধি করে মহাস্থবির অত্যন্ত অভিভূত হন।

অতঃপর তিনি শহরের কেন্দ্রস্থলের অনতিদূরে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যপূর্ণ স্থানে

বৌদ্ধবিহারের জন্য জমি নির্বাচন করে কলকাতায় ফিরে অসেন এবং বর্ষাব্রত গ্রহণ করেন। বর্ষাব্রত শেষ হবার আগেই তিনি ভয়ানক ব্যাধিগ্রস্ত হন। চিকিৎসকগণ তাঁকে অবিলম্বে জলবায়ু পরিবর্তন করতে পরামর্শ দেন। তিনি তাঁদের পরামর্শানুসারে ব্রত সমাপনান্তর রাঁচী যাত্রা করেন। দু-মাস কাল সেখানে অবস্থানের পর রোগযন্ত্রণার কিছু উপশম হলে তিনি তাঁর অন্যতম কর্মক্ষেত্র শিলং গমন করেন এবং সেখানকার কর্তব্য সমাপন করে দার্জিলিং-এ উপনীত হন। সেখানে তাঁর মনোনীত জমি পরিদর্শন করে তিনি ভক্তগণের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করেন। অতঃপর একদিন তিনি বর্ধমানাধিপতি বিজয়চাঁদ মহতাব মহোদয়ের বাসভবনে উপস্থিত হন। মহারাজা তাঁর যথোচিত অভ্যর্থনা করেন। তিনি কথাপ্রসঙ্গে পূর্বোক্ত মনোনীত জমির বিষয় উল্লেখ করেন, মহারাজা অকুণ্ঠিত চিত্তে তা দান করতে স্বীকৃত হন। এর অব্যবহিত পরেই মহাস্থবির যথারীতি সেই জমি লাভ করেন। তাঁর উপর বৌদ্ধবিহার ও ধর্মশালা নির্মাণের জন্য দৃঢ়সংকল্প হয়ে তিনি কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন।

তাঁর কলকাতায় প্রত্যাবর্তনের পরেই বাংলার তদানীন্তন শাসনকর্তা লর্ড কারমাইকেল ধর্মাঙ্কুর বিহার দর্শন করতে আসেন। এই উপলক্ষে ধর্মাঙ্কুর সভার একটি বিশেষ অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি সমবেত হন। সভাস্থলে সকলের আনন্দ বর্দ্ধন করে লর্ড কারমাইকেল ঘোষণা করেন—তক্ষশীলায় প্রাপ্ত বুদ্ধাস্থি ধর্মাঙ্কুর সভার হস্তেই অর্পণ করা হবে। এই অধিবেশনেই কাশিমবাজারের মহারাজা দানবীর মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী সেই বুদ্ধাস্থি সংরক্ষণার্থ স্তূপ নির্মাণের জন্য ধর্মাঙ্কুরের সংলগ্ন ৬ কাঠা পরিমাণ জমি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে দান করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। মহাস্থবির উভয়কেই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

অতঃপর তিনি জামসেদপুরে বৌদ্ধ বিহার নির্মাণের জন্য টাকা কোম্পানী হতে ১ বিঘা ১কাঠা পরিমাণ জমি প্রাপ্ত হন। এখানেও বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভার একটি শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময় তাঁর জন্মস্থান উনাইনপুরা গ্রামের সুপ্রাচীন বিহার ধ্বংসোন্মুখ হয়। এই বিহার ক্রমান্বয়ে তের জন বৌদ্ধাচার্যের বাসস্থলরূপে বৌদ্ধদের পুণ্যতীর্থ, এখানেই তাঁর উপাধ্যায় চট্টগ্রামের সঙ্ঘগুরু মহাত্মা পূর্ণাচার জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অবস্থান করেন। এর ভগ্নাবস্থা দেখে মহাস্থবিরের মন ব্যথিত হয়। তিনি অনুভব করেন—তাঁর হস্তক্ষেপ বিনা এর ধ্বংস অনিবার্য। অতীতের পুণ্যস্থিত বিজড়িত এই স্থানটিকে ধ্বংসের কবল হতে রক্ষা করবার জন্য তিনি এর আমূল সংস্কার করতে সংকল্প করেন। অতএব শিলং, দার্জিলিং ও জামসেদপুরে বৌদ্ধবিহার নির্মাণ, কলকাতায় বুদ্ধাস্থির উপর স্তূপ প্রতিষ্ঠা এবং জন্মস্থানের বিহার-সংস্কার ইত্যাদি অনেকগুলি ব্যয়সাপেক্ষ কাজ একসঙ্গে তাঁর উপর ন্যস্ত হয়।

একদিকে যেমন তাঁর কর্মভার দিনের পর দিন বেড়ে চলে, অন্যদিকে তেমনি তিনি

ব্যাধিপীড়িত জরাগ্রস্ত হয়ে পড়েন এবং একে একে মৃত্যুর কবলে আপনার বিশ্বস্ত সহকর্মীদের হারিয়ে অসহায় হন। এতৎসত্ত্বেও ভয় দুর্বলতা তাঁকে স্পর্শ করে নি। তিনি অটুট ধৈর্য ও দৃঢ় পরাক্রম নিয়ে আপনার বিপুল কর্তব্যভার বহনে অগ্রসর হন। এই কার্যগুলি সুসম্পন্ন করবার জন্য তিনি দেশ দেশান্তর ভ্রমণ করে অর্থ সংগ্রহ করতে থাকেন। অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে। তিনি চিকিৎসকগণের পরামর্শানুসারে স্বাস্থ্য পরিবর্তনের জন্য রাঁচী যেতে বাধ্য হন। স্বাস্থ্যের একটু উন্নতি হলেই আবার তিনি আপনার কর্তব্যভার গ্রহণ করে শিলং গমন করেন। আসামের তদানীন্তন শাসনকর্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে শিলং-এ তাঁর পরিকল্পিত বৌদ্ধ বিহার নির্মাণের জন্য এক বিঘা জমি প্রাপ্ত হন।

অতঃপর তিনি ভারতের প্রসিদ্ধ তীর্থস্থানসমূহ দর্শন করতে বের হন। তীর্থভ্রমণে মাসাধিক কাল অতিবাহিত করে তিনি আপনার প্রধান কর্মস্থল ধর্মাঙ্কুরে ফিরে আসেন। এর অল্পকাল পরেই তিনি দার্জিলিং গমন করেন এবং বর্ধমান মহারাজার প্রদত্ত জমির উপর বিহারের ভিত্তি স্থাপন করে নির্মাণ কার্য শুরু করে দেন। তাঁর প্রিয় শিষ্য আনন্দ স্বামী ও সর্দার লডেন লা মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে পাঁচ সহস্রাধিক টাকা ব্যয়ে অচিরেই বিহারের নির্মাণ কার্য সমাপ্ত হয়। এরপর ধর্মাঙ্কুরের দার্জিলিং শাখার দ্রুত উন্নতি হতে থাকে।

যদিও তাঁর জন্মস্থানের বিহার সংস্কার কার্য ইতিপূর্বে আরম্ভ হয়, অর্থের অভাবে তা যথাকালে সমাপ্ত হতে পারে নি। তিনি গ্রামবাসীদের উৎসাহিত করে তাদের নিকট হতে বার বার চাঁদা প্রাপ্ত হন এবং তাদের প্রদত্ত সেই অর্থে জীর্ণ বিহারখানিকে সুরম্য হর্মে পরিণত করেন। এই কার্যে সাত সহস্র টাকা ব্যয়িত হয়। তাঁরই উপদেশে গ্রামের দু-জন ভদ্রলোক তাঁদের পরলোকগত মাতাপিতার স্মৃতি রক্ষার জন্য বিহার প্রাঙ্গণে একান্তে একটি ধর্মশালা নির্মাণ করে বিহার সভার হস্তে সমর্পণ করেন। এর অনুসরণে মহাস্থবিরের আত্মীয়বর্গের প্রদত্ত অর্থে তাঁরই মাতাপিতার স্মৃতির উদ্দেশ্যে বিহারাধ্যক্ষের বাসোপযোগী একটি সুন্দর কক্ষও নির্মিত হয়। এভাবে মহাস্থবিরের অক্লান্ত পরিশ্রমে এই ঐতিহাসিক বিহার ধ্বংসের কবল রক্ষা পেয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠে।

দার্জিলিং-এ বিহার নির্মাণ এবং জন্মস্থানের বিহার সংস্কার এই দুটি কার্য সুসম্পন্ন করে তিনি শিলং-এ বিহার প্রতিষ্ঠা ও কলকাতায় বৌদ্ধ স্তূপ নির্মাণের কার্যে মনোনিবেশ করেন। এই সময় তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের বোমাং অঞ্চলের তদানীন্তন রাজার অভিষেক সভায় আমন্ত্রিত হন। তিনি মহাস্থবিরের অন্যতম ভক্ত এবং তাঁর বিবিধ অনুষ্ঠানে আর্থিক সহায়তা করেন। ভক্তের একান্ত অনুরোধ উপেক্ষা করতে না পেরে তিনি দুর্বল শরীরে বোমাং রাজদরবারে উপস্থিত হন এবং নবাভিষিক্ত রাজাকে আশীর্বাদ করেন। এর পর তিনি চাঁদা সংগ্রহের জন্য নানা স্থান পরিভ্রমণ করতে মনস্থ করেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে এই সংকল্প ত্যাগ করে তিনি অবিলম্বে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন।

কলকাতায় আপনার জরুরী কার্য শেষ করে তিনি আবার দেশ ভ্রমণে বের হয়ে ত্রিপুরায় গমন করেন। সেখানকার একটি গ্রামে জনৈক পরিব্রাজকের নবনির্মিত বিহারের দ্বারোদ্ঘাটন করে তিনি সেখানে ভগবান বুদ্ধের তিন ফিট উচ্চ একটি মর্মর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। বলা বাহুল্য, এই মূর্তিটি তাঁরই দান। সেখান থেকে তিনি আলিশ্বর নামক গ্রামে উপনীত হন এবং তথাকার বিহারের জন্য বুদ্ধের আর একটি ধ্যান মূর্তি দান করেন। অতঃপর তিনি চট্টগ্রাম হয়ে আকিয়াব যাত্রা করেন। সেখানে পৌঁছে তিনি আকিয়াবের বৃহত্তম সঙ্ঘারাম 'সুইজাদি'র অধ্যক্ষ স্বনামখ্যাত উঃ তেজারাম মহাস্থবিরের অতিথি হন। ইনি ব্রহ্মদেশের তৎকালীন জননেতা ভিক্ষু উত্তমেরই গুরু। উঃ তেজারাম মহাস্থবির আপনার প্রিয় বন্ধু কৃপাশরণের আকস্মিক উপস্থিতিতে অত্যন্ত আনন্দিত হন। উভয়ের মধ্যে কয়েক দিন ধরে অনেক অলাপ আলোচনা চলে। আলাপ প্রসঙ্গে কৃপাশরণ তাঁকে কলকাতায় ধর্মাঙ্কুর বিহারের পার্শ্বে ভিক্ষুসীমা বা ভিক্ষুদের বিনয় ব্রতানুষ্ঠানের ক্ষেত্র নির্মাণের জন্য অনুরোধ করেন। উঃ তেজারাম আনন্দের সঙ্গে তা সম্পাদন করতে প্রতিশ্রুত হন। এজন্য কৃপাশরণ তাঁকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন।

অতঃপর তিনি ধর্মাঙ্কুরে ভিক্ষুসীমা স্থাপনের আয়োজন করতে থাকেন। বলা বাহুল্য, এই কার্যের ব্যয়ভার উঃ তেজারাম মহাস্থবিরের নির্দেশে তাঁরই গৃহি-শিষ্যগণ গ্রহণ করেন। এই উপলক্ষে উঃ তেজারাম কলকাতায় আসেন। এই মাননীয় অতিথি বৌদ্ধ জনতা কর্তৃক বিপুলভাবে সংবর্দ্ধিত হন। তিনি কৃপাশরণের কর্মক্ষেত্র পরিদর্শন করে তৃপ্তিলাভ করেন এবং ভিক্ষুসীমার স্থান পর্যবেক্ষণ করে স্বদেশাভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হন।

কৃপাশরণ ভিক্ষুসীমা প্রতিষ্ঠার সঙ্গে বৌদ্ধস্তূপেরও ভিত্তিস্থাপন স্থিরীকৃত করেন। এই সুযোগে কলকাতায় আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ সম্মেলন আহ্বানের কথা তাঁর মনে জাগে। এতাদৃশ সম্মেলন আন্তর্জাতিক বৌদ্ধগণের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন যে সুদৃঢ় করবে তাতে তাঁর বিন্দুমাত্র সংশয় থাকে না। এর গুরুত্ব উপলব্ধি করে এবিষয়ে তিনি অত্যন্ত মনোযোগী হন এবং ধর্মাঙ্কুর সভার কার্যনির্বাহক সমিতির এক বিশেষ অধিবেশনে আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ সম্মেলন আহ্বানের প্রস্তাব করেন। তাঁর এই প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। ১৩৩১ সালের অগ্রহায়ণ পূর্ণিমা তিথি এই শুভ অনুষ্ঠানের দিন নির্ধারিত হয়।

এই শুভ দিন যখন নিকটবর্তী হতে থাকে, তখন মহাস্থবির আহার নিদ্রা ভুলে এর সাফল্যের জন্য চেষ্টিত হন। তিনি সকল বৌদ্ধ দেশের সঙ্ঘনায়কগণকে এবং বৃহৎ প্রতিষ্ঠান সমূহকে নিমন্ত্রণ করেন। ব্রহ্মের সঙ্ঘনায়ক সুপ্রসিদ্ধ নাটাজী সঙ্ঘারামের অধ্যক্ষ উঃ জটিল মহাস্থবির এই বৌদ্ধ মহাসম্মেলনের মূল সভাপতি নির্বাচিত হন। চট্টগ্রাম কলেজের অধ্যাপক অগ্‌গমহাপণ্ডিত ধর্মবংশ মহাস্থবির অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মনোনীত হন। প্রতিনিধিবর্গের বাসোপযোগী একটি প্রকাণ্ড বাড়ী একমাসের

জন্য ভাড়া করা হয় এবং তাঁদের জন্য দশ দিনের আহার্য দানের বিশেষ বন্দোবস্ত হয়। সমগ্র অনুষ্ঠান সুচারুরূপে সম্পন্ন করবার জন্য মহাস্থবির একটি কার্যালয় স্থাপন করেন। স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী বিভাগ, চিকিৎসা বিভাগ ইত্যাদি তার অনেকগুলি বিভাগ থাকে। ১৫০ জন বৌদ্ধ তরুণ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত হয়। ক্যাপ্টেন ডাঃ পি সি সেন চিকিৎসা বিভাগ পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। মহাস্থবিরের ভক্তবৃন্দ এই অনুষ্ঠানের ব্যয়ভার বহনের জন্য তাঁকে মুক্ত হস্তে দান করতে থাকেন।

নির্ধারিত দিনের সপ্তাহকাল পূর্ব হতে দেশ-দেশান্তর হতে সশিষ্য সঙ্ঘনায়কগণ ও নানা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবর্গ ধর্মাঙ্কুরে আগমন করতে থাকেন। দেখতে দেখতে ধর্মাঙ্কুর বিহার-ভবন ও ভাড়া করা বাড়ী অতিথি সমাগমে জনপূর্ণ হয়ে উঠে। পীতবাস-পরিহিত ভিক্ষুসঙ্ঘের গমনাগমনে কলকাতায় বিভিন্ন পথসমূহ নতুন শোভা ধারণ করে। কৌতূহলাক্রান্ত জনতা নানা দেশাগত এই নতুন অতিথিদের সমাবেশ দেখে বিস্ময়বিমুগ্ধ হয়। ইহা প্রাচীন ভারতের বৌদ্ধযুগের কথা স্মরণ করে দেয়।

বিভিন্ন বৌদ্ধদেশের সঙ্ঘনায়কগণ সমবেত হয়ে ভিক্ষুসীমা স্থাপনের বিষয় আলোচনা করেন। সম্যকভাবে বিনয়বিধি আলোচনার পর তাঁরা সম্মিলিত ভাবে সীমা স্থাপন করবার সিদ্ধান্ত করেন। অতঃপর নির্দিষ্ট স্থানে তাঁরা সমবেত হয়ে বিনয়নীতি অনুসরণে ভিক্ষুসীমা স্থাপন করেন। এতে বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের বিনয়কর্মানুষ্ঠানের বিশেষ সুবিধা হয়।

এর অব্যবহিত পরে বৌদ্ধস্তূপের ভিত্তি স্থাপন উপলক্ষে বিরাট জনতা পরিবৃত ভিক্ষুসঙ্ঘ সমবেত হন। জনতার তুমুল জয়ধ্বনির মধ্যে কাশিমবাজারের মহারাজা দানবীর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী স্বহস্তে আপনার প্রদত্ত জমির উপর স্তূপের ভিত্তিপাত করেন। অতঃপর ধর্মাঙ্কুরের সমীপবর্তী নালন্দা পার্কে বৌদ্ধ মহাসম্মেলনের অধিবেশন আরম্ভ হয়। সম্মেলনে বৌদ্ধধর্ম প্রচার বিষয়ক নানা প্রস্তাব গৃহীত হয়। নানা দেশের বিশিষ্ট বক্তা বিভিন্ন ভাষায় বক্তৃতা দান করেন।

সম্মেলনের অবসানে সম্মানার্হ অতিথিবর্গের প্রীতিবর্ধনের জন্য কৃপাশরণ সঙ্গীত সমিতি কর্তৃক গিরিশচন্দ্র ঘোষ রচিত বুদ্ধদেব-চরিত নাটক অভিনীত হয়। বিদেশাগত অতিথিগণ তা বিশেষভাবে উপভোগ করেন।

অবশেষে সঙ্ঘনায়কগণ ও প্রতিনিধিবর্গ ভারাক্রান্ত হৃদয় বিদায় গ্রহণ করেন। বলা বাহুল্য, এই ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানে ভারতে বৌদ্ধধর্মের নব জাগরণের সূচনা করে এবং আন্তর্জাতিক বৌদ্ধগণের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন সুদৃঢ় করে।

আট

মহাসম্মেলনের কার্যে মাসাধিক কাল মহাস্থবিরকে গুরুতর পরিশ্রম সহ্য করতে হয়। এর ফলে তাঁর দুর্বল স্বাস্থ্য আরও দুর্বলতর হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় তিনি দার্জিলিং-এর ধর্মাঙ্কুর শাখা পরিদর্শনের জন্য সেই দিকে যাত্রা করেন। পথে তাঁর রোগ বেড়ে উঠে। বাধ্য হয়ে তিনি অসুস্থ শরীরে জলপাইগুড়িতে জনৈক ভক্তের আতিথ্য গ্রহণ করেন। তাঁদের অকৃত্রিম সেবায় যত্নে অপেক্ষাকৃত সুস্থ হলে তিনি মাঘীপূর্ণিমা উৎসব সম্পন্ন করবার জন্য কলকাতায় ফিরে আসেন। তাঁর পৌরোহিত্য এই উৎসব আড়ম্বরপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়।

তাঁর স্বাস্থ্যের দৈনন্দিন অবনতি লক্ষ্য করে তাঁর হিতৈষী চিকিৎসকগণ তাঁকে দীর্ঘদিন বিশ্রামের জন্য পরামর্শ দেন। তক্ষশীলায় প্রাপ্ত বুদ্ধাস্থির উপর সুশোভন স্তূপ প্রতিষ্ঠার যে কর্তব্যভার তিনি গ্রহণ করেন, তা সুসম্পন্ন না করে বিশ্রাম গ্রহণের কথা তিনি মনেও আনতে পারেন নি। সুতরাং সেই পরামর্শ অনুসরণ না করে তিনি জরাজীর্ণ ব্যাধিগ্রস্ত শরীরে চাঁদা সংগ্রহের জন্য আকিয়াব অভিমুখে রওনা হন। আকিয়াবে পৌঁছেই তাঁর স্বাস্থ্যের ক্রমশঃ উন্নতি হতে থাকে। তাঁর উদ্দেশ্যের কথা স্মরণ করে আরও অধিকদিন বিশ্রাম ভোগকে তিনি যুক্তিসঙ্গত মনে করেন নি। অতএব তিনি আপনার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সফরে বের হন। তথাকার নানাস্থান ঘুরে তিনি প্রায় চার হাজার টাকা সংগ্রহ করেন এবং নানাবিধ দানসামগ্রী প্রাপ্ত হন। এই ভ্রমণে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে।

কঙ্কালসার দেহে তিনি কলকাতায় ফিরে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। দিনের পর দিন তাঁর রোগের অবস্থা খারাপ হতে থাকে। যদিও চিকিৎসার কোন ত্রুটি করা হয় নি, তবুও রোগের গতিবেগ অপ্রতিহত থাকে। তিনি হৃদয়ঙ্গম করেন—পারের ডাক এসেছে, তাঁকে ইহলোকের মায়া কাটাতেই হবে। তাঁর অসমাপ্ত কার্যের কথা ভেবে তিনি মনে যেন একটু বিচলিত হন। তখন তাঁর প্রতিভাত হয়—এতে তাঁর হাত নেই। যে কর্মের সত্ত্ব নিয়ে তিনি পৃথিবীতে এসেছেন, তাতে তাঁর অবহেলা হয় নি, তাঁর যাত্রাপথ আজ সমুজ্জ্বল।

তাঁর রোগের অবস্থা দেখে ভক্তগণ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। দর্শনার্থীদের যাতায়াত বর্ধিত হওয়ায় প্রতিদিন তাঁর রোগশয্যার পাশে ভিড় জমতে থাকে। তিনি আপনার রোগ যন্ত্রণা উপেক্ষা করে তাঁদের সঙ্গে আলাপে রত হন। এতে অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে উঠে। এইজন্য চিকিৎসকগণ দর্শনার্থীদের যাতায়াত নিয়ন্ত্রিত করেন। তিনি রোগ শয্যায় শয়ান অবস্থায় বলেন—"আমার দিন তো ফুরিয়ে এসেছে, স্তূপের কাজ আরম্ভ করতে পারলাম না, শিলং-এ প্রাপ্ত জমির উপর বিহার নির্মাণও বাকী রয়ে গেল। আমার বিশ্বাস—বৌদ্ধ সমাজই এই কার্যসমূহের ভার নেবে।" এই সময় তিনি তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র তরণীসেন বড়ুয়াকে চিঠি লিখে কাছে আনেন এবং তাঁকে বলেন—"বাবা, আমার ডাক এসেছে, আমি চললাম। তবে, আমার মৃতদেহখানি জন্মভূমির শীতল ক্রোড়ে আমার গুরুদেবের চিতাশয্যার পদপ্রান্তে পোড়াইও। এই তোমাকে বলে গেলাম।" মহাস্থবিরের কথা শুনে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে শুধু মাথা নেড়ে সম্মতি জ্ঞাপন করেন। তখন সন্ধ্যার তরল অন্ধকার নামে, নগরের সর্বত্র দীপ জ্বলে উঠে। মহাস্থবিরের চারিদিকে ভক্তগণ স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকেন। সমস্ত

ঘরময় এক অস্বাভাবিক নীরবতা বিরাজ করে। এই নিরবচ্ছিন্ন নীরবতার মধ্যে মহাস্থবির একবার চোখ মেলে উর্ধ পানে তাকান। পরক্ষণেই তিনি ভক্তগণকে যেন আশীর্বাদ করবার জন্য হাত তুলেন। হাত নামাবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি চিরনিদ্রায় অভিভূত হন। তখন মনে হয় যেন প্রবল ঝটিকায় একটি দীপ নিভে গেল। ভক্তগণের মধ্যে কেউ কেউ বালকের মতো কেঁদে উঠেন। সেখানে কারও নয়ন অনার্দ্র ছিল না।

মহাস্থবিরের দেহরক্ষার সংবাদ দাবাগ্নির মত কলকাতা শহরে ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর ভক্ত ও বন্ধুবর্গের আনা পুষ্পমাল্য ও পুষ্পস্তবকে তাঁর শবশয্যা আবৃত হয়ে যায়। তাঁর মৃতদেহ তিন দিন কলকাতায় রাখা হয়। এই তিন দিন ধরে ধর্মাঙ্কুরে দর্শনার্থী জনতার ভিড় দুর্বার হয়ে উঠে। নানা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হতে তাঁকে মালা অর্পণ করা হয়। ভক্তগণ তাঁর দেহসৎকারের জন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে মুক্ত হাতে দান করতে থাকেন। এর পরিচালনার জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত হয়।

অতঃপর মহাস্থবিরের অন্তিম ইচ্ছানুসারে তাঁর মৃতদেহ চট্টগ্রামে নিয়ে যাওয়ার বন্দোবস্ত হয়। তখন শহরে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা চলে এবং এই জন্য ১৪৪ ধারা প্রবর্তিত থাকে। অতএব পুলিশ কমিশনারের অনুমতি নিয়ে শোভাযাত্রা সহ মহাস্থবিরের শবাধার বের করা হয়। যখন বৌবাজার স্ট্রীট হয়ে শবাধার শিয়ালদহ ষ্টেশনাভিমুখে নীত হয়, তখন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য দলে দলে শোভাযাত্রায় যোগদান করেন। দেখতে দেখতে শোভাযাত্রা বিপুলাকার ধারণ করে। অতঃপর তাঁর শবাধার চট্টগ্রাম মেল-এর একটি রিজার্ভ কামরায় রক্ষিত হয়। তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র তরনীসেন প্রমুখ একদল তরুণ সেই শবাধারের অনুগমন করেন। গাড়ী গোয়ালন্দ পৌঁছলে তাঁর দর্শনার্থী লোকের ভিড় জমতে থাকে। অনেক কষ্টে ভিড়ের মধ্য দিয়ে তাঁর শবাধার পদ্মাবক্ষে জাহাজে তোলা হয়। তখন জাহাজের কর্তৃপক্ষ জনতার ভিড় কমাবার জন্য পুলিশের সাহায্য গ্রহণ করতে বাধ্য হন। পরদিন সকালে গাড়ী চট্টগ্রাম ষ্টেশনে পৌঁছলে শবাধার নিয়ে যাবার জন্য ষ্টেশনে বিপুল জনসমাবেশ হয়। সমবেত জনগণের মধ্যে অধ্যাপক অগ্‌গমহাপণ্ডিত ধর্মবংশ মহাস্থবির, জগচ্চন্দ্র মহাস্থবির, রামধন মহাস্থবির এবং জ্ঞানীশ্বর মহাস্থবির প্রমুখ বৌদ্ধনেতৃবৃন্দের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অতঃপর বিরাট শোভাযাত্রা সহ শবাধার নন্দনকাননের বৌদ্ধ বিহারে নীত হয়। তখন ভক্তবৃন্দ দলে দলে পুষ্পমাল্য ও পুষ্পস্তবক নিয়ে বিহারে সমবেত হন। তাঁদের প্রদত্ত মালা ও স্তবকে শবাধার আচ্ছন্ন হয়ে যায়। সন্ধ্যায় মহাস্থবিরের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনের জন্য বিহার প্রাঙ্গণে একটি সভার অধিবেশন হয়। তথায় তিল ধারণের স্থান থাকে না। সভায় বক্তাগণ তাঁর জীবনের বিভিন্ন দিক আলোচনা করে বক্তৃতা প্রদান করেন।

পরদিন স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীর সাহায্যে তাঁর শবাধার তাঁর জন্মস্থান উনাইনপুরা অভিমুখে নীত হয়। পথে নানা গ্রামের জনগণ তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে শবাধার উনাইনপুরায় নীত হলে গ্রামের মহিলাগণ শোকার্তভাবে অশ্রু বিসর্জন করেন। এই প্রাণস্পর্শী দৃশ্য দেখে অনেকেই অশ্রু সংবরণ করতে পারেন নি। সেখানে

জনতার দর্শনের জন্য দশ দিন শবাধার খোলা রাখা হয়। দূর ও সমীপবর্তী গ্রাম হতে আবালবৃদ্ধবনিতা বহু লোক দলে দলে সমবেত হয়ে তাঁর চরণ দর্শন করে ভক্তির অর্ঘ অর্পণ করেন। এই দশ দিনে বহু সহস্র লোক তাঁর মৃতদেহ দর্শনের সুযোগ লাভ করেন। দশম দিনে ইতিকর্তব্য নির্ধারণের জন্য বৌদ্ধনেতৃবর্গের একটি পরামর্শ সভা বসে। সেই সভায় সর্বসম্মতিক্রমে পরবর্তী ফাল্গুনী পূর্ণিমায় মহাস্থবিরের দাহক্রিয়ার দিন নির্ধারিত হয়। সভার অবসানে শবাধার বন্ধ করে তৎজন্য নির্মিত বেদীতে রক্ষিত হয়।

দেহসৎকারের দিন যখন নিকটবর্তী হয়ে আসে, তখন বিশিষ্ট ভিক্ষু ও গৃহীদের আর একটি যুক্ত সভার অধিবেশন হয়। সেই সভায় সুশৃঙ্খলভাবে দাহক্রিয়া সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যনির্বাহের জন্য অনেকগুলি কমিটি নিযুক্ত হয়। বলা বাহুল্য, এই কমিটিগুলির সুনিয়ন্ত্রণে সমগ্র অনুষ্ঠান আশাতীতভাবে সাফল্যমণ্ডিত হয়।

সেই নির্ধারিত দিনে সকাল হতে সমগ্র উনাইনপুরা গ্রাম দূরাগত জনতার আলাপগুঞ্জনে মুখরিত হয়ে উঠে। গ্রামাভিমুখে জনস্রোত অবিরাম গতিতে বইতে থাকে। সমাগত বৌদ্ধ ভিক্ষুদের পীত-বসনের আভায় চারদিক যেন পীতাভ হয়ে উঠে। অপরাহ্নে গ্রামের সমীপবর্তী বিস্তীর্ণ প্রান্তরে সজ্জিত মণ্ডপে সঙ্ঘনায়ক প্রজ্ঞাতিষ্য মহাস্থবিরের পৌরোহিত্যে বিরাট শোকসভার অধিবেশন হয়। শত শত গ্রাম হতে মিছিল করে জনগণ সভায় যোগদান করেন। সমগ্র প্রান্তর জনাকীর্ণ হয়ে যায়। এই অভাবনীয় জনসমাবেশ দেখে সুপ্রাচীন ব্যক্তিগণ বলেন এই অঞ্চলে এত বৃহৎ জনসমাবেশ কল্পনার অতীত। সভায় মহাস্থবিরের মহাপ্রয়াণে নানা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হতে বহু শোকপত্র পঠিত হয়। শোকপত্রের আধিক্য হেতু অনেকগুলি অপঠিত থাকে এবং বক্তাগণকে বক্তৃতার বিষয় সংক্ষেপ করতে হয়। সভাপতি মহোদয় আপনার সরল ও প্রাণস্পর্শী ভাষায় মহাস্থবিরের সংক্ষিপ্ত জীবনী আলোচনা করে জনতাকে মন্ত্রমুগ্ধবৎ স্তব্ধ করেন।

শবাধার খুলে মহাস্থবিরের অটুট দেহখানিকে আবার নতুন চীবরে আবৃত করে পুষ্পমাল্যে ভূষিত করা হয়। তাঁরই গুরুভাই ও বাল্যবন্ধু জগচ্চন্দ্র মহাস্থবিরের প্রদত্ত সুসজ্জিত পুষ্পরথে শবাধার স্থাপিত হয়। তখন জনতার মাধ্যমে তা শ্মশানাভিমুখে নীত হতে থাকে। পীতবাসপরিহত ভিক্ষুগণ শান্ত সংযত ভাবে শবানুগমন করেন। চতুর্দিক হতে পুষ্প বর্ষিত হয়ে পথ কুসুমাস্তৃত হয়। স্থানে স্থানে দর্শনকাতর জনতার ভিড়ের চাপে পথ রোধ হয়। স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী অনেক কষ্টে পথ পরিষ্কার করে। এভাবে বাধাবিরোধ অতিক্রম করে যখন শবাধার শ্মশানে আনীত হয়, তখন শেষ দর্শনের জন্য জনতার ভিড় দুর্বার হয়ে উঠে। নেতৃবৃন্দের সনির্বন্ধ অনুরোধে ক্রমে ভিড় একটু কমে যায়। এই সময় শবাধার চন্দনকাষ্ঠে সজ্জিত চিতার উপর রাখা হয়। সঙ্গে সঙ্গে অজস্র পুষ্পবর্ষণ হতে থাকে। এভাবে কিছুক্ষণ অতিবাহিত হবার পর চিতায় অগ্নিসংযোগ করা হয়। দেখতে দেখতে অগ্নির লেলিহাণ শিখা অমর কৃপাশরণের নশ্বর দেহকে গ্রাস করে লোকদৃষ্টির অতীত করে ফেলে। তখন পূর্বাকাশে পূর্ণিমার চাঁদ যেন আপনার জ্যোৎস্নাময় স্তব্ধতার ভাষায় বলে উঠে—

অনিচ্চা বত সংখারা .....।

পরিশিষ্ট—১

কর্মযোগী কৃপাশরণের জীবনের কালানুক্রমিক ঘটনাপঞ্জি

১৮৬৫ ২২ জুন/৭ আষাঢ় মঙ্গলবার বর্তমান বাংলাদেশের চট্টগ্রাম জেলার (পটিয়া উপজেলা) উনাইনপুরা গ্রামে জন্ম। পিতা আনন্দমোহন বড়ুয়া, মাতা আরাধনা।

১৮৭৫ পিতা আনন্দমোহন বড়ুয়ার মৃত্যু।

১৮৮১ ১৪ এপ্রিল সুধনচন্দ্র মহাস্থবিরের কাছে প্রব্রজ্যা গ্রহণ।

১৮৮৫ আচার্য পূর্ণাচার মহাস্থবিরের উপাধ্যায়ত্বে উপসম্পদা লাভ। উপাধ্যায়ের সঙ্গে বুদ্ধগয়ায় তীর্থযাত্রা। মাতা আরাধনার মৃত্যু।

১৮৮৬ ১৫ জুন মঙ্গলবার কলকাতায় আগমন। ৭২/৭৩ মঙ্গলা লেনস্থ নবীন বিহারে অবস্থান।

১৮৮৯ ২১/২৬ বো স্ট্রীটস্থ মহানগর বিহারে অবস্থান।

১৮৯২ ৫ অক্টোবর বুধবার প্রবারণা (আশ্বিনী) পূর্ণিমা তিথিতে বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা (বেঙ্গল বুদ্ধিস্ট অ্যাসোসিয়েশন) প্রতিষ্ঠা।

১৮৯৩ মহাবীর ভিক্ষুর সঙ্গে লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, কুশীনগর পরিভ্রমণ।

১৮৯৬ পার্বত্য চট্টগ্রামের রাংগামাটিতে চাকমারাজা ভুবনমোহন রায়ের রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠানে গমন।

১৯০০ কলকাতার বৌবাজার এলাকায় ৫ ললিতমোহন দাস লেনে সাড়ে চার হাজার টাকায় পাঁচ কাঠা জমি ক্রয়।

১৯০১ উত্তরপ্রদেশে বুদ্ধের লীলাভূমি জেতবন বিহার আবিষ্কার।
বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর বিহারের ভিত্তি স্থাপন।

১৯০২ পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজানগর শাক্যমুণি বিহারে বিশিষ্ট ভিক্ষুসঙ্ঘের উপস্থিতিতে আচার্য পূর্ণাচার কর্তৃক মহাস্থবির পদে বরণ। বার্মা (মায়ানমার) পরিভ্রমণ।

১৯০৩ আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর বিহারের দ্বারোদ্ঘাটন। উচ্চ শিক্ষিত যুবক পূর্ণচন্দ্র বড়ুয়ার (বহুস্সুত পিয়সীলী সমন পুন্নানন্দ সামী) প্রথম শিষ্যত্ব গ্রহণ। জ্ঞানরত্ন কবিধ্বজ গুণালঙ্কার মহাস্থবিরের চট্টগ্রাম থেকে বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর বিহারে আগমন। ধর্মাঙ্কুর বিহারে কৃপাশরণের প্রথম বর্ষাবাস উদ্‌যাপন।

১৯০৫ ৩১ডিসেম্বর তিব্বতের ধর্মগুরু তাসি লামাকে ধর্মাঙ্কুর বিহারে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন। বাঙ্গলা গভর্ণমেন্ট কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েলসকে আশীর্বাদ প্রদান।

১৯০৬ মাঘী পূর্ণিমায় নগেন্দ্রলাল বড়ুয়াকে শ্রামণ্যধর্মে দীক্ষিত করে নিজব্যয়ে তাঁকে উচ্চশিক্ষার্থে শ্রীলঙ্কায় প্রেরণ।

১৯০৭ লক্ষ্ণৌ শহরে তথাকার ডিভিসানাল কমিশনারের আনুকূল্যে দশ কাঠা নিষ্কর জমি লাভ। বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভার শাখা ও লক্ষ্ণৌ বোধিসত্ত্ব বিহারের ভিত্তিস্থাপন। সিমলা শৈল সমিতি নামে সিমলায় বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভার শাখা স্থাপন।

১৯০৮ আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে গুণালঙ্কার মহাস্থবির ও সমণ পূর্ণানন্দ সামীর যুগ্ম সম্পাদনায় জগজ্জ্যোতি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ। লক্ষ্ণৌ বোধিসত্ত্ব বিহারের নির্মাণকার্য কালীকুমার ভিক্ষুর হস্তে সমর্পণ। আসামের ডিব্রুগড়ে বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভার শাখা স্থাপন। বার্মা

(মায়ানমার) পরিভ্রমণ।

১৯০৯ ধর্মাঙ্কুর বিহারে গুণালঙ্কার লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা। চট্টগ্রামে আচার্য পূর্ণাচারের শেষকৃত্যানুষ্ঠানে যোগদান। ২৮ ডিসেম্বর আকিয়াবের প্রধান ভিক্ষু প্রদত্ত ছ'হাজার টাকা মূল্যের সাড়ে পাঁচ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট অষ্টধাতুনির্মিত বিরল বুদ্ধমূর্তি ধর্মাঙ্কুর বিহারে প্রতিষ্ঠা।

১৯১০ ভারত সরকারের আমন্ত্রিত অতিথি মহামান্য দলাই লামাকে ধর্মাঙ্কুর বিহারে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন। ২৩ জানুয়ারী স্বরাষ্টসচিব বাটলারের ধর্মাঙ্কুর বিহার পরিদর্শন। ১২ ফেব্রুয়ারী রাজস্বসচিব কারলাইলের ধর্মাঙ্কুর বিহার পরিদর্শন। জুলাই মাসে দার্জিলিং পরিভ্রমণ এবং তথায় শাখা সভা স্থাপন। ধর্মাঙ্কুরে যুব সম্মেলন আহ্বান।

১৯১১ ১৮ মার্চ মহাবোধি সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা অনাগারিক ধর্মপালের আমন্ত্রণে শ্রীলঙ্কা পরিভ্রমণ। দিল্লির দরবারে আমন্ত্রিত হয়ে গুণালঙ্কার মহাস্থবির সহ উপস্থিত থেকে যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েলসকে আশীর্বাদ প্রদান।

১৯১২ অনাগারিক ধর্মপালের সঙ্গে লক্ষ্ণৌ ও দিল্লি ভ্রমণ। কলকাতাস্থ চট্টগ্রামের হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ ছাত্রদের অধিবেশন আহ্বান। কলকাতায় বুদ্ধিস্ট হোস্টেল প্রতিষ্ঠা। আসাম পরিভ্রমণ।

১৯১৩ বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর বিহারের দ্বিতল নির্মাণ। কৃপাশরণ ফ্রি ইনস্টিটিউসান নামে অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা। ধর্মাঙ্কুরে প্রথম বৌদ্ধ মহিলা সম্মিলনী স্থাপন।

১৯১৪ কৃপাশরণের আগ্রহাতিশয্যে এবং স্যর আশুতোষ ও বাটলারের সুপারিশে সরকারী বৃত্তি প্রাপ্ত হয়ে বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভার সম্পাদক বেণীমাধব বড়ুয়ার উচ্চ শিক্ষার্থে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে গমন।

১৯১৫ কৃপাশরণের আমন্ত্রণে চট্টগ্রামে অনাগারিক ধর্মপালের সম্বর্ধনা। ধর্মাঙ্কুর বিহারে কৃপাশরণের মর্মরমূর্তি প্রতিষ্ঠা। এতে সভাপতি ও প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে স্যর আশুতোষ ও অনাগারিক ধর্মপাল। রাঁচীতে বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভার শাখা স্থাপন। ৬ ডিসেম্বর সভা রেজিষ্টার্ড সংস্থারূপে পঞ্জীকরণ।

১৯১৬ নৈশ অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা। সুযোগ্য সহকর্মী গুণালঙ্কার মহাস্থবিরের মৃত্যু। কলকাতা মিউনিসিপালিটির সাহায্যে ধর্মাঙ্কুর সম্মুখস্থ রাস্তার বুদ্ধিস্ট টেম্পল স্ট্রীট নামকরণ।

১৯১৭ ২৮ ফেব্রুয়ারী লর্ড কারমাইকেলের ধর্মাঙ্কুর পরিদর্শন। এশিয়াবাসীদের মধ্যে সর্বপ্রথম ডি লিট প্রাপ্ত হয়ে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেণীমাধব বড়ুয়ার প্রত্যাবর্তন এবং কৃপাশরণের উদ্যোগে সংবর্ধনা জ্ঞাপন; এতে সভাপতিত্ব করেন স্যর দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী। ভুটান পরিভ্রমণ।

১৯১৮ ২৪ মে শিলঙ-এ বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর শাখা স্থাপন। বেথুন কলেজের অধ্যক্ষা মিস জেনোর পৌরোহিত্য ধর্মাঙ্কুরের মহিলা সম্মেলন আহ্বান।

১৯১৯ দার্জিলিঙ-এ কৃপাশরণের চতুর্পঞ্চাশতম জন্মোৎসব পালন। বিহার নির্মাণের জন্য বর্ধমানের মহারাজা বিজয়চাঁদ মহতাব কর্তৃক জমি দান। ইঞ্জিনিয়ার প্রিয়নাথ রায়ের উপর বিহার নির্মাণের দায়িত্ব অর্পণ। চট্টগ্রামের সীতাকুন্ডে বৌদ্ধমেলা পরিদর্শন।

১৯২০ ১০ এপ্রিল বাঙলার শাসনকর্তা রোনাল্ডশের ধর্মাঙ্কুর পরিদর্শন। স্যর আশুতোষের সম্বুদ্ধাগম চক্রবর্তী উপাধি প্রাপ্তিতে ধর্মাঙ্কুরে সংবর্ধনা প্রদান। লক্ষ্ণৌতে হিন্দু সন্ন্যাসী শিবানন্দ ভারতীর (বোধানন্দ ভিক্ষু) শিষ্যত্ব গ্রহণ।

১৯২১ জন্মগ্রাম উনাইনপুরায় বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভার শাখা স্থাপন। গ্রামবাসীর প্রদত্ত অর্থে জীর্ণ বিহারের সংস্কারসাধন। রাঙ্গামাটিতে সভার শাখা স্থাপন।

১৯২২ জামশেদপুরের টাটানগরে সভার শাখা স্থাপন; তথায় বিহার নির্মাণের জন্য টাটা কোম্পানী প্রদত্ত এক বিঘা এক কাঠা জমি লাভ।

১৯২৪ কলকাতায় আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ সম্মেলন আহ্বান। ধর্মাঙ্কুর বিহারে ভিক্ষুসীমা প্রতিষ্ঠা। বুদ্ধধাতু স্তূপের ভিত্তিস্থাপন।

১৯২৫ শিলঙ-এ বিহার নির্মাণ। দার্জিলিঙ বিহার পরিদর্শন।

১৯২৬ ৩০ এপ্রিল শুক্রবার কলকাতায় মহাপ্রয়াণ।

১৯২৭ জন্মভূমিতে শেষকৃত্যানুষ্ঠান।

পরিশিষ্ট—২

কৃপাশরণ বিষয়ক প্রকাশনা

১৯৫০ *কর্মযোগী কৃপাশরণ।* শীলানন্দ ব্রহ্মচারী। প্রকাশক : তরনীসেন বড়ুয়া। বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর বিহার।

১৯৬৫ *কর্মযোগী কৃপাশরণ।* শীলানন্দ ব্রহ্মচারী (১৯৫০-এ প্রকাশিত বইটির ১৬ পৃষ্ঠার একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ)। প্রকাশক : বনবিহারী বড়ুয়া। বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা।

১৯৭৩ *নালন্দা কৃপাশরণ স্মৃতি সংখ্যা।* সম্পাদক ধর্মাধার মহাস্থবির। প্রকাশক : প্রজ্ঞাজ্যোতি ভিক্ষু (মহাস্থবির)। ইডেন হাসপাতাল রোড।

১৯৮১ *জগজ্যোতি কৃপাশরণ সংখ্যা।* সম্পাদক হেমেন্দুবিকাশ চৌধুরী। প্রকাশক : ধর্মপাল মহাথের, বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা।

১৯৮৭ *Bengal Buddhist Association and its Founder-President Kripasaran Mahathera* by Hemendu Bikash Chowdhury, published by Kamal Barua, BDS.

১৯৯০ *কৃপাশরণ ১২৫ জন্মবর্ষ স্মারক গ্রন্থ।* সম্পাদক হেমেন্দুবিকাশ চৌধুরী (ইংরেজি বাংলা দ্বিভাষিক স্মারক গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ৮৪ + ৮৪) প্রকাশক : ধর্মপাল মহাথের। বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা।

২০০৫ *Kripasaran : An Epitome of Buddhist Revival* by Bhikkhu Bodhipala, published by Hemendu Bikash Chowdhury, BDS

২০০৬ *কর্মযোগী কৃপাশরণ মহাস্থবির : বৌদ্ধধর্ম বা ধ্রুবতারা* (হিন্দি)। ডঃ রাজেন্দ্র রাম। প্রকাশক : হেমেন্দুবিকাশ চৌধুরী, বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা।

২০০৭ *কর্মযোগী কৃপাশরণ।* শীলানন্দ ব্রহ্মচারী (পরিমার্জিত ২য় সংস্করণ) প্রকাশক : হেমেন্দুবিকাশ চৌধুরী, বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা।